গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬১ বর্ষ ৪০ সংখ্যা ৫ - ১১ জুন, ২০০৯ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in মূল্য ঃ ২ টাকা

উত্তর কোরিয়ার পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষায় ভারত সরকারের নিন্দা দ্বিচারিতা ও নিকৃষ্ট সুবিধাবাদ

— নীহার মুখার্জী

উত্তর কোরিয়ার পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষায় ভারত সরকারের নিন্দার তীব্র সমালোচনা করে ২৬ মে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী বলেন, বিভিন্ন রাষ্ট্রের হাতে পরমাণু অস্ত্র থাকা এবং সমস্ত পরমাণু অস্ত্র ধ্বংস ও সামগ্রিক নিরস্ত্রীকরণ না করাই যখন স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে বাধা, তখন নিজেদের অস্ত্রভাণ্ডার ধ্বংস না করে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার সাম্রাজ্যবাদী দোসরদের সঙ্গে এক হয়ে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজদের হুকুম তামিল করতে নারাজ সমাজতান্ত্রিক উত্তর কোরিয়াকে হেয় করার ভারত সরকারের অপচেষ্টাকে নিন্দা করার কোনও ভাষাই যথেষ্ট নয়। সাম্রাজ্যবাদী শিবির ও ভারত সরকারের এই অপকর্মের উদ্দেশ্য হল, পারমাণবিক অস্ত্রের উপর তাদের একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম রাখা। তিনি বলেন, উত্তর কোরিয়াকে নিন্দা করা তাদের দ্বিচারিতা ও নিকৃষ্ট সুবিধাবাদকেই উদ্‌ঘাটিত করেছে।

বিপন্ন মানুষের ত্রাণে উদার হস্তে সাহায্য করুন

এস ইউ সি আই রাজ্য কমিটির আবেদন

আপনারা জানেন, গত ২৫ মে,২০০৯ প্রবল ঘূর্ণিঝড় এবং বর্ষণে দক্ষিণ ২৪ পরগণা, উত্তর ২৪ পরগণা, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি এবং পরের দিন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। কলকাতা শহরেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে। সর্বাপেক্ষা বিপন্ন হয়েছে দক্ষিণ ২৪পরগণা জেলার কুলতলি, গোসাবা, বাসন্তী, ক্যানিং, পাথরপ্রতিমা, রায়দীঘি, সাগর, নামখানা, কাকদ্বীপ এবং উত্তর ২৪ পরগণার সন্দেশখালি ও হিঙ্গলগঞ্জের কয়েক লক্ষ পরিবার। ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে হাজার হাজার বাড়ি সম্পূর্ণ ধসে পড়েছে। প্রবল জলস্রোতে অসংখ্য গবাদি পশু ও খাদ্য-বস্ত্র সহ ঘরের যাবতীয় জিনিসপত্র ভেসে গেছে। লোনা জল ঢুকে হাজার হাজার একর কৃষিজমি এবং মাঠের ফসল, পুকুরের জল ও মাছ নষ্ট হয়েছে। জলের তোড়ে এবং ঘর ও গাছের তলায় চাপা পড়ে মারাও গেছে বহু মানুষ, মৃতের সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে। এখনও গ্রামের পর গ্রাম, পথঘাট সবকিছু জলমগ্ন। লক্ষ লক্ষ মানুষ জলবন্দি হয়ে আছে। সর্বস্ব হারিয়ে বিপন্ন মানুষগুলি খোলা আকাশের নিচে পড়ে আছে। সামান্য কিছু মানুষ স্কুলবাড়িতে বা এরকম কোনও স্থানে আশ্রয় নিয়েছে। সর্বস্ব হারানোর বেদনায়, স্বজন হারানোর মর্মান্তিক যন্ত্রণায়, তীব্র ক্ষুধার জ্বালায়, পিপাসার কাতরতায় সর্বত্রই শুধু হাহাকার আর কান্নার রোল। অথচ এই বিপন্ন মানুষগুলোকে বাঁচাবার জন্য নেই কোনও সরকার। এমনকী সাইক্লোনের পূর্বাভাস থাকা সত্ত্বেও, মানুষকে বিপদমুক্ত এলাকায় সরিয়ে দেওয়ার সময় থাকা সত্ত্বেও, কোনও ব্যবস্থাই রাজ্য সরকার নেয়নি। এ রাজ্যে যে একটা সরকার আছে, তার যে কিছু দায়িত্ব আছে, ২৫ মে'র সকাল থেকে ২৬ মে সকাল পর্যন্ত ২৪ ঘন্টার অধিক সময় এই বিপন্ন মানুষেরা তা এতটুকু টের পায়নি। অথচ টিভিতে, রেডিওতে, সংবাদপত্রে কতই না ঘোষণা— 'যুদ্ধকালীন তৎপরতার সাথে উদ্ধারকার্য ও রিলিফ বণ্টন হচ্ছে।' শুধু ঘোষণাই সার, আর কিছু নয়। 'যুদ্ধকালীন' আর 'তৎপরতা' এই শব্দ দুটি না হয় বাদ দিলাম, দুর্যোগের ২৪ ঘন্টার মধ্যে

আটের পাতায় দেখুন

দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য অংশের মতো কুলতলি জুড়ে শুধুই হাহাকার

কুলতলির লক্ষাধিক মানুষ আজ সত্যিই নিঃস্ব। তাদের সব কিছু চলে গেছে, আছে শুধু বাঁচার একটা অদম্য ইচ্ছা। ঘরবাড়ি, ফসল, সম্বৎসরের জন্য মজুত ধান-চাল, পুকুরের মাছ, হাঁস-মুরগি, গবাদি পশু প্রভৃতি সর্বস্ব হারিয়ে তারা খোলা আকাশের নিচে এসে দাঁড়িয়েছে। বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় 'আয়লা'র ভয়ঙ্কর আক্রমণের পর কুলতলির মানুষের অবস্থা ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত অন্যান্য এলাকার মতোই।

মাতলা নদী এবং তার শাখাপ্রশাখাগুলির বাঁধ অসংখ্য জায়গায় ভেঙে গিয়ে প্রবল জলোচ্ছ্বাস গ্রামের পর গ্রাম ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। ২৫ হাজার মাটির বাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আরও অনেক বেশি। ভেসে গেছে সদ্য মাঠ থেকে ওঠা ধানের গোলাগুলি। নদী থেকে লোনা জল ঢুকে যাওয়ায় শাকসব্জি সহ মাঠের সমস্ত ফসল, সমস্ত পুকুরের মাছ পচে নষ্ট হয়ে গেছে। ৩০-৩২ বছর আগের তৈরি সংস্কারবিহীন জীর্ণ নদীবাঁধগুলি ভেঙে কয়েক মিটার উঁচু জলোচ্ছ্বাস মুহূর্তের মধ্যে আছড়ে পড়ায় মানুষ সহায়-সম্পত্তি প্রায় কিছুই রক্ষা করতে পারেনি।

ত্রাণশিবিরে আর্ত মানুষদের সাথে কথা বলছেন সাংসদ কমরেড তরুণ মণ্ডল

কুলতলির গোপালগঞ্জ, মেরিগঞ্জ, গোদাবর-কুন্দখালি, দেউলবাড়ি, গুড়গুড়িয়া ভুবনেশ্বরী, মৈপীঠ সর্বত্রই একই চিত্র। হাজার হাজার মানুষ উঁচু রাস্তার ধারে এসে আশ্রয় নিয়েছে। সর্বত্রই এস ইউ সি আই কর্মীরা এলাকার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। বহু জায়গায় স্কুলগুলিতেও কোমর সমান জল জমে যাওয়ায় যেখানেই উঁচু জায়গা পাওয়া গেছে, সেখানেই জরুরি ভিত্তিতে রান্নার কাজ চালু করেছেন তাঁরা। প্রথম ৪৮ ঘন্টায় প্রশাসনের কোনও অস্তিত্বই টের পাননি দুর্গত মানুষেরা। মুখ্যমন্ত্রী দুর্যোগ মোকাবিলায় তড়িঘড়ি জয়নগরে প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের বৈঠক ডাকলেও স্থানীয় বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার ও কুলতলির বিধায়ক কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদারকে বৈঠকের খবর দিতেই নাকি ভুলে গেছেন! মুখ্যমন্ত্রী আসছেন সংবাদ পেয়ে তাঁরাই বরং গিয়ে দেখা করে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন।

কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার ২৫ মে সন্ধ্যায় প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যেই ছুটে যান কুলতলির বিডিও-র কাছে। উদ্ধার ও ত্রাণের কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে জানতে গিয়ে শোনেন, ব্যবস্থা প্রায় কিছুই নেওয়া হয়নি। বিডিও বলেন, শুকনো খাবারের ব্যবস্থা করার জন্য কন্ট্রাকটরকে খবর পাঠানো হয়েছে। তৎপরতার এ হেন নমুনা দেখে কমরেড হালদার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি তৎক্ষণাৎ এ সব সংগ্রহ করার দাবি করেন। বিডিও বলেন, এই প্রবল ঝড়ের মধ্যে বাজারের দোকানপাট বন্ধ, এখনই কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। কমরেড হালদার বলেন, আপনি আমার সঙ্গে চলুন, মানুষের এই চরম দুর্গতির সময়ে প্রয়োজনে দোকানদারদের বাড়ি থেকে ডেকে এনে জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে হবে। ঝড়ের অজুহাত দিয়ে নিরাপদে বসে থাকা চলবে না। শেষপর্যন্ত এইভাবেই চিঁড়ে, গুড়, মুড়ি প্রভৃতি যা কিছু স্থানীয় বাজারে পাওয়া গেল, তা-ই সংগ্রহ করে ক্ষুধার্ত মানুষের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। এই একটি ঘটনা থেকেই প্রশাসনের প্রস্তুতি ও তৎপরতা স্পষ্ট হয়ে যায়। অথচ এই ঘূর্ণিঝড় হঠাৎ করে এসে পড়েনি। তার আগাম সর্তকতা ছিল। প্রশাসন আন্তরিক হলে, মানুষের প্রতি ন্যূনতম দরদবোধ থাকলে অনায়াসে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে পারত, বহু জায়গায় ঝড়ের মধ্যেই এবং অন্যত্র ঝড়ের অব্যবহিত পরেই ত্রাণসামগ্রী নিয়ে দুর্গত মানুষদের

পাঁচের পাতায় দেখুন

মূল্যবৃদ্ধিতে নাভিশ্বাস সাধারণ মানুষের

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ঘুম ভাঙাতে চাই প্রবল গণআন্দোলন

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধির কবলে রাজ্যের তথা দেশের মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। ঘূর্ণিঝড়ের বহু আগে থেকেই চাল-ডাল-আলু-চিনি থেকে শুরু করে সব্জি-ডিম-মাছ পর্যন্ত ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধির কবলে। সারা দেশজুড়ে গরিব নিম্নবিত্ত মানুষ তো বটেই, মধ্যবিত্ত মানুষজনও এই মূল্যবৃদ্ধির কোপে একেবারে জেরবার। আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির আক্রমণে তারা আক্ষরিক অর্থেই দিশেহারা।

জনগণের উপর এই ভয়ঙ্কর আক্রমণ ঠেকাতে দেশে কোনও সরকার আছে বলেও মানুষ টের পাচ্ছে না। অথচ, এখন লোকসভা নির্বাচনে জিতে যে সরকার কেন্দ্রে গদিয়ান হয়েছে, সেই কংগ্রেস সরকারই গত ৫ বছর দেশের ক্ষমতায় ছিল। এ রাজ্যের ক্ষমতায় বসে আছে একটানা ৩২ বছরের সিপিএম সরকার। মূল্যবৃদ্ধির উপর কোনও সরকার কোনও কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ জারি করছে না। মূল্যবৃদ্ধিকে এমন ভয়ঙ্কর পর্যায়ে পৌঁছে দিতে এই সরকারগুলিই বাস্তবে সহায়তা করছে।

রাজ্য সরকারের কাজ কি কেবল সবকিছুর দায় কেন্দ্রের ঘাড়ে চাপানো

রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি অভিযোগের আঙুল তুলে বলেছেন, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি একটি সর্বভারতীয় বিষয়। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নিয়ন্ত্রণ আইন কেন্দ্রীয় সরকার শিথিল করে দেওয়ায় রাজ্যের পক্ষে সমস্যা হয়ে গিয়েছে। মজুতদার-ফাটকাবাজদের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও কি এই সরকারের নেই। তাহলে এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কি কিছু করণীয় নেই? জনস্বার্থে সরকার একজনও মজুতদার বা ফাটকাবাজ কিংবা কালোবাজারিকে গ্রেপ্তার করেছে কি? তাদের ৩২ বছরের শাসনে এমন একটি ঘটনাও ঘটেনি। বরং তারা কংগ্রেসের মতোই বৃহৎ ব্যবসাদারদের স্বার্থরক্ষায় মূল্যবৃদ্ধি ঘটতে দিয়েছে, কালোবাজারি-মজুতদারি চলতে দিচ্ছে। সরকার ও প্রশাসনের মদতে পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতেই সার, বীজ ও কীটনাশক ওষুধের ব্যাপক কালোবাজারি চলছে। সার ব্যবসায়ীরা সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে কোথাও ১০০ টাকা, কোথাও ২০০ টাকা পর্যন্ত বেশি দাম আদায় করেছে চাষিদের কাছ থেকে। একটি সার কিনলে তার সঙ্গে আরও একটি সার অবশ্য কেনার শর্ত চাপিয়েছে এবং কৃষকদের তা মানতে বাধ্য করেছে। অবাধে বাইরে পাচার হয়েছে বিপুল পরিমাণ সার। অস্বাভাবিক চড়া দাম দিয়ে উপযুক্ত মানের বীজের বদলে রোগগ্রস্ত ও ভেজাল আলুবীজ কিনতে হয়েছে চাষিকে। বীজ নিয়েও চলেছে ব্যাপক কালোবাজারি। ধসা রোগের সুযোগ নিয়ে কীটনাশক ব্যবসায়ীরা চাষিকে অপ্রয়োজনীয় ওষুধ কিনতে প্ররোচিত করে দেদার মুনাফা লুটেছে। এদিকে ভেজাল কীটনাশকে বাজার ছেয়ে গেছে। সরকার কোনও ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি।

অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নিয়ন্ত্রণ আইনকে শিথিল করার কাজটি আজ হয়েছে, এমনটি নয়। বিগত ইউপিএ সরকারের সঙ্গে সিপিএম সাড়ে চার বছর ছিল। তারা নাকি কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের 'প্রাণভোমরা' ছিল। সরকারে না থাকলেও সরকারকে সমর্থনের বিনিময়ে তারা কেন্দ্রের কাছ থেকে সর্বপ্রকার সুযোগসুবিধা আদায় করে নিয়েছে। অথচ জনগণের স্বার্থে এই সাড়ে চার বছরে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নিয়ন্ত্রণ আইন কঠোরভাবে প্রয়োগের যাবতীয় ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়ে তারা করাল না কেন? কেউ তাদের বাধা দিত না। আসলে তাদের টিকিও কংগ্রেস-বিজেপি'র মতোই দেশের খাদ্য-ব্যবসায়ীদের কাছে বাঁধা আছে।

দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গে চাল উৎপাদনে দেশের মধ্যে শীর্ষস্থানে থাকা সত্ত্বেও সেখানে চালের দাম কেন এমন বাড়ে? রাজ্যের সরকারই স্বীকার করেছে যে, গত বছরের তুলনায় কম হলেও রাজ্যে এবার যা আলু উৎপাদন (৬০ লক্ষ মেট্রিক টন) হয়েছে, সেটা রাজ্যের প্রয়োজনের (বীজ সহ রাজ্যের মানুষের চাহিদা ৫০ লক্ষ মেট্রিক টন) তুলনায় ১০ লক্ষ মেট্রিক টন বেশি। অথচ, রাজ্যের মানুষের স্বার্থকে দু'পায়ে মাড়িয়ে রাজ্য সরকার ও সিপিএম দলের স্নেহধন্য বৃহৎ ব্যবসায়ীদের আলু-বোঝাই ট্রাক রাজ্যের ও দেশের বাইরে যেতে দেওয়া হয়েছে কাটমানির বিনিময়ে। এভাবে, একদিকে বাইরে আলু পাচারের সুযোগ করে দিয়ে, অন্যদিকে রাজ্যে আলুর কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে আলুর দাম কয়েকগুণ বাড়িয়ে বৃহৎ ব্যবসায়ীদের বিপুল মুনাফা লোটার সুযোগ করে দেওয়া হল। তাছাড়া, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ও অত্যন্ত পচনশীল সব্জি, যেমন বেগুন-পটল-ঝিঙে-শাক-সব্জিরও ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। সবকিছুর জন্যই যদি কেন্দ্র দায়ী হয়, তবে রাজ্য সরকারটি আছে কী করতে?

২১ মে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত বলেছেন, 'যেসব খাদ্যসামগ্রী ও সব্জি রাজ্যের বাইরে থেকে আনতে হয় না, তার মূল্যবৃদ্ধিতে সরকার উদ্বিগ্ন। এই মূল্যবৃদ্ধি রুখতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' সরকারি ঘোষণার এক সপ্তাহ পরেও সরকারি ব্যবস্থা গ্রহণের বিন্দুমাত্র নমুনাও রাজ্যবাসী দেখতে পাচ্ছে না। মূল্যবৃদ্ধির আগুনে পুড়ছে গরিব-মধ্যবিত্ত মানুষজনের জীবন। ২৩ মে অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন, 'রাজ্যের হাতে যে ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতা নিয়েই বেআইনী মজুত উদ্ধারে নামবে প্রশাসন। এর জন্য রাজ্যের প্রতিটি জেলায় নির্দেশ পাঠানো হয়েছে' (গণশক্তি, ২৪-০৫-০৯)। কোথায় মজুত উদ্ধার! রাজ্যে একটি ক্ষেত্রেও হয়েছে? সংবাদপত্রে প্রচার করা হচ্ছে, 'তেল-ডাল-চিনি থেকে শুরু করে শাক-সব্জি ও মাছের দাম আকাশ-ছোঁয়ায় অবশেষে নড়েচড়ে বসেছে রাজ্য সরকার'। কোথায় 'নড়াচড়া'?

রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছে, বিদেশ থেকে আমদানি করা চিনিতে তারা যে চার শতাংশ হারে যুক্তমূল্য কর বা ভ্যাট আদায় করে, সেটা তারা তুলে দিয়ে চিনির দাম কমিয়ে দেবে। এই ভ্যাট তারা এতদিন তুলে দেয়নি কেন? কর্পোরেট হাউস বা অসাধু ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষায় তো সরকারের এতটুকুও দেরি হয় না।

কেন্দ্রের সরকার সাধারণ মানুষের সর্বনাশ করে খাদ্য-ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করছে

কেন্দ্রীয় সরকারে যখনই যারা বসেছে, সে কংগ্রেসই হোক, বিজেপিই হোক, আর সিপিএম সমর্থিত দেবেগৌড়া কিংবা গুজরাল সরকার হোক, প্রত্যেকেই দেশের গরিব-সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষার কথা বলতে বলতে আসলে তাদের সর্বনাশই করে গেছে, মালিক পুঁজিপতিশ্রেণী ও বৃহৎ ব্যবসাদারদের মুনাফার অঙ্ক বাড়িয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাই করেছে। দেশে গম ও চিনির মূল্যবৃদ্ধি এই সর্বনাশা প্রক্রিয়ারই অনিবার্য পরিণাম।

অন্যদিকে, সার-বীজ-কীটনাশকের চড়া দর নিয়ন্ত্রণ করে কৃষকদের চাষের খরচ কমানোর জন্য সরকার কিছুই করে না। ফলে, মূলত মহাজনী ঋণের ফাঁদে পড়ে প্রতি বছর হাজার হাজার কৃষক আত্মহত্যা করছে। গত পাঁচ বছরের কেন্দ্রীয় ইউপিএ সরকারের রাজত্বে আত্মঘাতী কৃষকের সংখ্যা তাই লক্ষাধিক। কৃষকের ঘাম ও রক্তের বিনিময়ে যে পরিমাণ গম ও চিনি দেশে উৎপন্ন হচ্ছে, তা দিয়েই দেশের মানুষের প্রয়োজন মিটে যায়। সরকারের দেওয়া পরিসংখ্যানই তার প্রমাণ। শুধু দরকার, উৎপন্ন সেই গম ও চিনির সদ্ব্যবহার ও সুবন্টন। একটা সরকারের প্রয়োজন তো সেখানেই। কিন্তু, গত পাঁচ বছরে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার ও তার কৃষিমন্ত্রী শরদ পাওয়ার দেশের গম ও চিনি বিদেশে রফতানির অনুমতি বিলিয়েছেন অকাতরে। বৃহৎ ব্যবসাদারেরা তাই এই সরকারের উপর বেজায় খুশি। তাদের আশীর্বাদে ধন্য হয়ে শরদ পাওয়ার এবারও কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী হয়েছেন। দেশের প্রয়োজনীয় গম ও চিনি বিদেশে বেচে দিলে দেশে যে অভাব তৈরি হবে — এ সত্য একটা শিশুও জানে। এরপরও দেশে গম ও চিনির সঙ্কটের ধুয়া তুলে বিদেশ থেকে বেশি দরে গম-চিনি আমদানির অনুমতি জারি করেন কৃষিমন্ত্রী। বৃহৎ ব্যবসায়ীদের কেরামতিতে গম ও চিনির দাম বাড়ে।

কৌশলে চাষিদের কম দাম দিচ্ছে সরকার

সরকার দেশের চাষিদের থেকে গম ও চিনি কিনতে প্রথমে অত্যন্ত কম দাম ঘোষণা করে। তার উপর সামান্য বেশি দাম দিয়ে বৃহৎ ব্যবসায়ীরা যাতে চাষিদের থেকে বেশির ভাগ গম-চিনি কিনে নিয়ে মজুত করে ফেলতে পারে, তার সুব্যবস্থা করে দেয়। কারগিল, রিলায়েন্স, আইটিসি, ব্রিটানিয়া, এ ডব্লু বি ইন্ডিয়া, দিল্লি ফ্লাওয়ার মিল-এর মতো বৃহৎ খাদ্য ব্যবসায়ীরা, এমনকী অস্ট্রেলিয়ান হুইট বোর্ড আমাদের দেশের গ্রামে গ্রামে গিয়ে চাষিদের থেকে সরাসরি গম কিনছে। ফলে সরকারের মজুতভাণ্ডারে গম-চিনির মজুত অনেক কমে যায়। সরকার সেটাই চায়। দেশের সাধারণ মানুষকে বাঁচানোর জন্য যে মজুতভাণ্ডার সরকারের আছে, সরকার পরিকল্পনা করেই সেই জরুরি মজুতভাণ্ডারটিকে দুর্বল করে তুলছে। এই দুর্বলকরণের প্রক্রিয়াটি এদেশে শুরু করে সিপিএম সমর্থিত দেবেগৌড়া সরকার। ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত এদেশে চালু ছিল যে রেশন ব্যবস্থা, সেটাকে বলা হয় দেশের গণবন্টন ব্যবস্থা। দেবেগৌড়া সরকার দেশের গণবন্টন ব্যবস্থার জায়গায় প্রথম বিপিএল-এপিএল বিভাজন নিয়ে আসে। ঘোষণা করে, বিপিএল-এর মানুষরাই রেশনের জিনিসপত্র পাওয়ার অধিকারী, অন্যরা নয়। এইভাবে বিপিএল-এর ঠিক উপরের স্তরে থাকা প্রচুর গরিব মানুষকে এপিএল-এ ঠেলে দিয়ে তারা বোঝালো — দেশের বড় মজুতভাণ্ডারটির আর প্রয়োজন নেই। তারপর থেকে চলেছে কেন্দ্রীয় মজুতভাণ্ডারটিকে ক্রমাগত আরও দুর্বল করার কাজ।

কৃষকদের থেকে সরাসরি খাদ্যব্যবসায়ীদের খাদ্য কেনার উপর যে বিধিনিষেধ আরোপ করা ছিল, সেই বাধা বা নিয়ন্ত্রণ ধীরে ধীরে তুলে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয় বিজেপি সরকারের আমল থেকেই। সিপিএম সমর্থনপুষ্ট বিগত কংগ্রেসের ইউপিএ সরকার সেই সর্বনাশা নীতি রদ করার বদলে তাকেই কার্যকরী করতে আরও বেশি উদ্যোগী হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা নিয়েছে। এমনকী এজন্য এখন কোনও লাইসেন্স পর্যন্ত লাগছে না। এই কারণেই সরকার এফসিআইয়ের মতো সরকারি এজেন্সিগুলিকে খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে ক্রমশ ঠুঁটো জগন্নাথ বা অকার্যকরী ভূমিকায় পরিকল্পিতভাবেই ঠেলে দিয়েছে। তার ফলে, যে কেন্দ্রীয় মজুতভাণ্ডারে এই ক'বছর আগে খাদ্যশস্য উপচে পড়ত, সেই ভাণ্ডারটি পরিচালনার খরচ কমিয়ে দেওয়া ও লাভজনক করার পথ গ্রহণ করল কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার। দেশের উৎপাদিত খাদ্যশস্য সরকারের হাতে এনে রেশন মারফত গরিব-সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার যে উপযুক্ত নীতি, তা সরকার গ্রহণ করেনি। তার বদলে বৃহৎ ব্যবসায়ীদের রফতানিকারক সংস্থার হাতে সরকারি মজুতভাণ্ডারের খাদ্যশস্য আক্ষরিক অর্থেই নামমাত্র মূল্যে তুলে দিয়েছে। সরকারি নির্দেশে এফ সি আই (ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া) রেশনে বিপিএল তালিকাভুক্ত মানুষদের জন্য যে দর সেই দরে, এমনকী তার থেকেও কম দরে মজুতভাণ্ডারের খাদ্যশস্য বেচে দিয়েছে। আর সেই খাদ্যশস্য নিয়ে ব্যবসা করে দেদার মুনাফা করেছে ব্যবসাদারেরা। তাতে গমের রফতানি বাণিজ্য বেড়েছে বটে, কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে প্রয়োজনীয় গমের পরিমাণ কমে গেছে। অতএব বিদেশ থেকে আমদানি করার নির্দেশ জারি। সরকার যে দরে দেশে চাষিদের থেকে গম কিনেছিল, তার প্রায় দেড়গুণ দরে বিদেশ থেকে গম আমদানি করেছে। দেশের চাষিদের থেকে সরকার গম কেনার সময় কম দাম দেবে, কিন্তু বিদেশের ব্যবসাদারদের থেকে গম কিনবে বেশি দরে। চমৎকার কৃষক স্বার্থরক্ষা! ২০০৬-০৭ সালে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার বিদেশি বহুজাতিকদের থেকে ৬০ লক্ষ টন গম কিনেছিল ৯ টাকা ২৬ পয়সা কেজি দরে, অথচ পাঞ্জাব ও হরিয়ানার চাষিদের কাছ থেকে সরকার গম কিনেছিল মাত্র ৭ টাকা কেজি দরে। পরের বছর ২০০৭-০৮ সালে ১০ লক্ষ টন গম বহুজাতিকদের থেকে আমদানি করতে সরকার কেজি প্রতি ১৪ টাকা ৮২ পয়সা দিয়েছে, অথচ ওই বছর চাষিদের থেকে গম কেনা হয়েছে মাত্র ৮ টাকা ৫০ পয়সা কেজি দরে। সরকার খাদ্যের বাজার পুরো ছেড়ে রেখেছে খাদ্য ব্যবসায়ীদের হাতে।

সরকার গম তো আমদানি করছেই। সেই সঙ্গে, বৃহৎ ব্যবসাদারদেরও আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তাদের আমদানিকৃত গমের উপর থেকে সরকারি আমদানি শুল্ক ছাড় দেওয়া হয়েছে। সেজন্য কিন্তু ওই গমের দাম কম হচ্ছে না। এই ছাড় দেওয়া শুল্ক সবটাই ব্যবসাদারদের মুনাফার ভাণ্ডারে গিয়ে উঠছে। এইভাবে শুল্ক ছাড় দেওয়ায় সরকারের যে ঘাটতি হল, সরকার সেটা অন্যান্য ক্ষেত্রে ট্যাক্স বাড়িয়ে তুলে নেবে জনগণের পকেট থেকে। নয়তো ঘাটতির অজুহাতে শিক্ষা-স্বাস্থ্য প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক খাতে বরাদ্দ ছাঁটাই করবে, রেশনে চাল-গম-চিনির দাম বাড়াবে। ব্যবসাদারেরা দেশের চাষিদের থেকে অনেক কম দামে যে খাদ্যশস্য কিনে মজুত করে রেখেছিল, সেগুলিও বিদেশ থেকে আমদানি করা খাদ্যশস্যের দাম অনুযায়ী বিক্রি করে তারা বিপুল মুনাফা লোটে। ফলে, সরকারের অনুসৃত নীতিরই পরিণাম এই ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি। এটা হঠাৎ করে ঘটছে না। আজ নয়, ২০০৬ সালে এই মূল্যবৃদ্ধি প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ-দাতা 'ইকনমিক অ্যাডভাইসরি কমিটি' পরিষ্কারভাবেই বলেছিল, 'খাদ্যশস্যের দাম কমবে না, বরং তা বেড়েই চলবে'। আর এই প্রবণতাকে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন 'হেলদি ট্রেন্ড' বা স্বাস্থ্যসম্মত (সূত্র ঃ দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ২৩-০৬-০৬)। এরা গম-চাল-চিনির মূল্যবৃদ্ধি ঠেকাতে কার্যকরী ব্যবস্থা সহজে গ্রহণ করতে চাইবে?

এমনিভাবে জনসাধারণের স্বার্থকে দু-পায়ে মাড়িয়ে নির্বিবাদে বৃহৎ ব্যবসাদারদের লুঠের ব্যবস্থা করে গিয়েছে কংগ্রেস সরকার। সিপিএম সাড়ে চার বছর তাদের সমর্থন দিয়ে রক্ষা করে গিয়েছে। একবারও তারা কংগ্রেসের এই নীতির বিরুদ্ধে লোকসভা অচল করেনি, কিংবা সরকারের থেকে সমর্থন তুলে নেওয়ার হুমকিও দেয়নি। এখন বিরোধী ভূমিকায় সিপিএম বসেছে। পশ্চিমবঙ্গে তারা নিজেদের দায়িত্ব পালন না করে কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলছে, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নিয়ন্ত্রণ আইন কেন্দ্রীয় সরকার শিথিল করে দেওয়ায় সমস্যা হয়ে গেছে।

রাজ্যে মুনাফাখোর ব্যবসাদারদের তারা অতি আপনজন। টাটা, গোয়েঙ্কা, জিন্দাল, আম্বানি ও সালিমদের স্বার্থরক্ষায় তারা কংগ্রেস ও বিজেপি-র থেকেও যে চ্যাম্পিয়ন, সেটা প্রমাণে তারা কেমন মরিয়া, রাজ্যের মানুষ নিজেদের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় তা মর্মে মর্মে অনুভব করছে। এই সরকার গরিব সাধারণ মানুষের স্বার্থে মজুত উদ্ধারে পুলিশ-প্রশাসনকে নামাবে, মজুতদার-কালোবাজারিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে, কেন্দ্রীয় সরকারের মালিকতোষণ নীতির বিরুদ্ধে গণআন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তা রাজ্যের মানুষ আজ আর বিশ্বাস করে না। ফলে, জনগণকেই গণআন্দোলনের আঘাত হেনে মজুতদারি ও কালোবাজারির বিরুদ্ধে লড়তে হবে, মজুত উদ্ধারে নামতে হবে।

কে বলেছে এই জনাদেশ সংস্কারের পক্ষে

বুর্জোয়া ব্যবস্থার কট্টর সমর্থক কিছু চিন্তাশীল মানুষ এবারের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলছেন ঃ (১) মানুষ বিপুল হারে ভোট দিয়েছে কেন্দ্রে একটি স্থায়ী সরকার গঠনের জন্য, (২) কংগ্রেস এই বিরাট সাফল্য পেয়েছে তার জনমোহিনী নীতির জন্য, (৩) মানুষ রায় দিয়েছে সংস্কার কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ফলে, তাঁরা বলতে চাইছেন, এই নতুন সরকারকে সংস্কার কর্মসূচিগুলি অতি দ্রুত শেষ করতে হবে।

তাঁদের এই বক্তব্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। এবারে বিপুল হারে ভোট দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে মূলত পশ্চিমবঙ্গে। অন্যান্য রাজ্যে বিপুল হারে ভোট পড়েছে, পরিসংখ্যান তা বলে না। এ রাজ্যে এত ভোট পড়ার কারণ হল, সিপিএমের শ্বাসরোধকারী ৩২ বছরের অপশাসন থেকে পশ্চিমবাংলাকে মুক্ত করার এক প্রবল আকুতি, যা ঘরে ঘরে সৃষ্টি হয়েছিল। বলা বাহুল্য, সিপিএমকে যে পরাস্ত করা সম্ভব এই আস্থা মানুষের মনে গেঁথে দিয়েছিল সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের সংগ্রাম। ফলে, পশ্চিমবঙ্গে ভোট হয়েছে, ''পরিবর্তন চাই'' স্লোগানে, ''সিপিএম হঠাও'' স্লোগানে। এখানে স্থায়ী সরকার গঠন, কংগ্রেসের 'জনমোহিনী' নীতি বা 'সংস্কার' কোনওটাই ভোটারদের সামনে বিবেচ্য বিষয় ছিল না।

অন্যান্য রাজ্যে ভোটচিত্রটি কী রকম ছিল? প্রথম দফায় নির্বাচনে ভোট পড়ার হার ছিল — বিহার ৪৬ শতাংশ, উত্তরপ্রদেশ ৪৯ শতাংশ, ঝাড়খণ্ড ৫০ শতাংশ, ছত্তিশগড় ৫১ শতাংশ, ওড়িশা ৫৩ শতাংশ, মহারাষ্ট্র ৫৪ শতাংশ, কেরল ৬০ শতাংশ। দ্বিতীয় দফায় সারা দেশে গড়ে ভোট পড়েছে ৫৫ শতাংশ। তৃতীয় দফায় ভোটদানের হার আরও কম, প্রায় ৫০ শতাংশ। তৃতীয় দফায় ভোট পড়েছে উত্তরপ্রদেশে ৪৫ শতাংশ, মহারাষ্ট্রে ৪৫ শতাংশ, মধ্যপ্রদেশে ৪৫ শতাংশ, বিহারে ৪৮ শতাংশ, জম্মু-কাশ্মীরে ২৫ শতাংশ, গুজরাটে ৫০ শতাংশ, কর্ণাটকে ৫৭ শতাংশ। চতুর্থ দফায় গড় ভোট ৫৭ শতাংশ। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে পড়েছে ৭৫ শতাংশ, দিল্লিতে ৫২ শতাংশ, রাজস্থানে ৬০ শতাংশ, হরিয়ানায় ৬৩ শতাংশ, বিহারে ৩৯ শতাংশ। ভোটের এই হার কি বলে মানুষ বিপুল হারে ভোট দিয়েছে? ভোটের হার বরং পরিষ্কারই জানিয়ে দেয়, অধিকাংশ মানুষ ছিল ভোট সম্পর্কে নিরুত্তাপ।

১ মে আনন্দবাজার পত্রিকা ''তৃতীয় পর্বে আরও কমল ভোটের হার, উদ্বেগে নেতারা'' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে বলেছে, 'দেশের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে ভোট দিতে বারবার আবেদন জানিয়েছেন চিত্রতারকারা। তবু সেভাবে সাড়া মিলল না।' ভোটের প্রতি ভোটারদের এই নির্লিপ্ত মানসিকতা, উদাসীনতা এবারের নির্বাচনের একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বিজেপি নেতা এল কে আদবানি বলেছেন, ভোট দেওয়া বাধ্যতামূলক করা যায় কিনা, নির্বাচন কমিশন ও রাজনৈতিক দলগুলিকে তা ভাবতে হবে। কেন ভোটের হার এত কম, সে প্রসঙ্গে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নীলোৎপল বসু বলেছেন, ''রাজ্যে রাজ্যে যেসব দল ক্ষমতায়, তারাই ভোটারদের উৎসাহিত করতে পারছে না বলেই এমনটা হচ্ছে''। প্রশ্ন হল, কেন্দ্রে বা রাজ্যে রাজ্যে যারা ক্ষমতায়, তাদের শাসন, নীতি যদি জনগণের জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ-স্বস্তিই এনে দিয়ে থাকে, তাহলে কি এভাবে ভোটের প্রতি নির্লিপ্ততা বা উদাসীনতা আসতে পারে? যারা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, তাদের সম্পর্কে জনগণের মধ্যে যদি, 'ফিল-গুড' বা সুখানুভূতি থাকত, তাহলে মানুষ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে শুধু নিজে দিত তাই নয়, সক্রিয় হয়ে সকলকেই ভোটদানে সামিল করাত। ভোট সম্পর্কে এরকম নৈরাশ্যমূলক অবস্থান তারা নিত না। ফলে মানুষ বিপুল হারে ভোট দিয়েছে একথা যেমন সত্য নয়, তেমনি কংগ্রেসের নীতির প্রতি সমর্থন জানিয়ে মানুষ ভোট দিয়েছে, এটাও সত্য নয়।

বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যমের যে সাংবাদিককুল বা কলমচিরা কংগ্রেসের 'জনমোহিনী' নীতির গুণকীর্তনে উদ্বাহু হয়ে উঠেছেন, বোধহয় তাঁরা বুঝতে পারছেন — ব্যাপারটা একটু বেশি বেশি এবং দৃষ্টিকটু হয়ে উঠছে। তাই কংগ্রেস সরকারের 'দায় ও দায়িত্ব' স্মরণ করিয়ে দিয়ে ২৭মে আনন্দবাজার পত্রিকা সম্পাদকীয়তে লিখেছে, ''...শিক্ষার প্রসঙ্গই সর্বাগ্রে বিবেচ্য। বাজেটের অন্তত ছয় শতাংশ বরাদ্দ করিতে হইবে শিক্ষার জন্য, ইহা দীর্ঘদিনের দাবি। দেশবাসী শিক্ষাসেস দিতে আপত্তি করে নাই।'' বাস্তবেও মানুষ শিক্ষাসেস দিতে কোনওদিনই আপত্তি করেনি। কারণ, তারা আশা করেছে, তার ফলে দেশের শিক্ষাবাজেটে যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে, বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশুদের সংখ্যা কমবে, শিক্ষা সর্বজনীন এবং সার্থক হবে। কার্যত তার কিছুই হয়নি। শিক্ষার জন্য বরাদ্দ এখন ছয় শতাংশের অনেক কম। বস্তুত শিক্ষাসেস যোগ হওয়ার পর সরকারের বরাদ্দ আগের চেয়ে কমে গেছে।

প্রশ্ন হল, শিক্ষাসেস বাবদ আদায়ীকৃত এই টাকা কোথায় গেল? শিক্ষার নামে টাকা তুলে সেই টাকা শিক্ষাখাতে খরচ না করে তবে কী করা হয়েছে? সেই টাকা কি শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষাদপ্তরের কর্তারা আত্মসাৎ করেছেন, নাকি মন্দার কবলে পড়া পুঁজিপতিদের 'স্টিমুলাস প্যাকেজ' হিসাবে দেওয়া হয়েছে? মনমোহন সিং সরকার এসব প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যেতে পারে না। দ্বিতীয়ত, চূড়ান্ত মূল্যবৃদ্ধির বাজারে এবং টাকার মানের ক্রমহ্রাসমান প্রেক্ষাপটে যে সরকার শিক্ষাবাজেট ক্রমাগত কমায় — সেই সরকার যে শিক্ষার প্রতি কম গুরুত্ব দেয় তা মুর্খেও বোঝে। তৎসত্ত্বেও কংগ্রেসী নীতিকে জনমোহিনী বলে প্রচার করার একটা চেষ্টা লক্ষ করা যাচ্ছে।

আনন্দবাজার ওই সম্পাদকীয়তে আরও লিখেছে, ''সুপ্রিমকোর্ট শিশুপুষ্টির বিষয়ে যে ন্যূনতম লক্ষ্য বাঁধিয়া দিয়াছিল তাহা এখনও পূরণ হইল না''। কেন হল না? দেশে কি খাদ্যের অভাব? আনন্দবাজার আরেক সম্পাদকীয় (২৬-৫-০৯) দেখিয়েছে, ''দেশের শস্যগুদামগুলি স্ফীত, প্রয়োজনের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি খাদ্য মজুত আছে''। তাহলে গুদামের তালা খুলে সেই খাদ্য সরবরাহ করা হলনা কেন? খাদ্যদপ্তরের মন্ত্রীরা এবং বিশাল আমলাবাহিনী কী করছিলেন? কী করছিলেন মনমোহন সিং? দেশের মধ্যে খাদ্য মজুত থাকা সত্ত্বেও অর্ধাহারে-অনাহারে মানুষ থাকে, অপুষ্টিতে ভোগে — আর প্রধানমন্ত্রী এসবের কোনও খোঁজ রাখেন না? এটা কি কোনও সুশাসন? এটা কি সাফল্য?

খাদ্য নিয়ে আরেকটি নির্লজ্জ রসিকতা কংগ্রেস সাধারণ মানুষের সঙ্গে করতে চলেছে। সংবাদে প্রকাশ, মনমোহন সিং সরকার খাদ্যের অধিকার আইন পাশ করানোর কথা ভাবছে। এই আইন দ্বারা কংগ্রেস কী দিতে চায় সাধারণ মানুষকে? গুদাম ভর্তি থাকা সত্ত্বেও যারা খাদ্য দিতে পারেনা, তারা যদি খাদ্যের অধিকার আইন করেও, তার দ্বারা কি গরিবের পেট ভরবে? বহু ঢাকঢোল পিটিয়ে ২০০৮ সালে অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা আইন পূর্বতন সিপিএম সমর্থিত ইউপিএ সরকার করেছিল। কিন্তু এই আইন কার্যকর করা নিয়ে সরকারের কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। তাহলে এমন নিষ্ফলা আইন প্রণয়ন করার কী লক্ষ্য ছিল? এর লক্ষ্য ছিল, শ্রমিকদের স্বার্থের নামে একটা কিছু করা, যার দ্বারা সাময়িকভাবে হলেও শ্রমিকদের সমর্থন কংগ্রেস লাভ করতে পারবে। এর দ্বারা কংগ্রেস ভোটের ক্ষেত্রে লাভবান হলেও তার প্রতারণার চরিত্রটি কি গোপন থাকল?

এরকম আরেকটি প্রতারণার পদক্ষেপ নিতে চলেছেন অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী। তিনি বলেছেন, সংস্কারে সঙ্গেই আমআদমির স্বার্থরক্ষা করবেন। অর্থনীতির পণ্ডিতরা বলছেন, কাগজে লিখছেন, সংস্কার এবং আমআদমির স্বার্থের ভারসাম্য রক্ষা করা খুবই কঠিন কাজ। শিল্পমহলের আশা প্রণবই পারবেন। নানা পরামর্শ কংগ্রেস সরকারের উদ্দেশ্যে নানা মহল দিচ্ছে। শিল্পপতিদের এক মুখপত্র লিখেছে, জরুরি হল বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নিকরণ করা। তবে বিজেপি আমলে যেভাবে বিলগ্নিকরণ মন্ত্রক দাঁড় করিয়ে সরকারি সম্পত্তি বেচে দেওয়া হচ্ছিল, তেমন মন্ত্রক খাড়া করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু কাজের কাজটি করতে হবে।

কেন বিলগ্নিকরণ করতে হবে? ওরা বলছে, বিলগ্নিকরণের মাধ্যমে তোলা প্রতি দশ হাজার কোটি টাকা রাজকোষ ঘাটতির পরিমাণ ০.২৫ শতাংশ কমায়। কেন রাজকোষ ঘাটতি? পুঁজিপতিদের বিপুল ট্যাক্স ছাড় দেওয়া, তাদের কোটি কোটি টাকার স্টিমুলাস প্যাকেজ দেওয়া সহ মাথাভারি প্রশাসন, অপচয়-দুর্নীতি — এসবের কারণে এই রাজকোষ ঘাটতি। গত আর্থিক বছরে মন্দার কারণে শিল্পপতিদের কাছ থেকে কর আদায়ে ঘাটতি ছিল ৬০ হাজার কোটি টাকা। এখন এই রাজকোষ ঘাটতি পূরণের কথা বলা হচ্ছে মন্দাক্রান্ত পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে সচল রাখার জন্য — পুঁজিপতিদের আরও টাকা দেওয়ার জন্য। অর্থাৎ সোজা কথায় পুঁজিপতিদের আরও প্যাকেজ দিতে সরকারি সম্পত্তি বিক্রি কর; এনটিপিসি, এনএইচপিসি, পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন ইত্যাদিতে শেয়ার বেচে দাও, তারপর বেসরকারীকরণ কর, এবং এরই নাম তারা দাঁড় করিয়েছে সংস্কার। ভারতের কোন্ ভোটার কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছে সরকারি সম্পত্তি বেচে পুঁজিপতিদের উপঢৌকন দেওয়ার জন্য? সংস্কারের কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই জনাদেশ — যারা এসব বলে, তারা মহা ধাপ্পাবাজ, ধুরন্ধর এবং পুঁজিপতিদের একনিষ্ঠ তল্পিবাহক। এদের সম্পর্কে জনগণকে সাবধান থাকা জরুরি।

এই সংস্কারের আবাহনকারীরা লিখেছেন, ''পেট্রোলিয়াম জ্বালানির মূল্যও নিয়ন্ত্রণের বাহিরে লইয়া আসা প্রয়োজন''। তাদের বক্তব্য, পেট্রল, ডিজেল, কেরোসিন, রান্নার গ্যাসের দাম সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না, বাজার ঠিক করবে তার দাম কী হবে। এটাই নাকি অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়ম। যারা এরূপ বলছেন, তারা পরক্ষণেই কেন বলছেন, মন্দা কাটাতে পুঁজিপতিদের সরকারি স্টিমুলাস প্যাকেজ দিতে হবে? কেন তারা এখানে বাজারনির্ভর হচ্ছেন না? এই দ্বিচারিতা কেন? আসলে পুঁজিপতিরা চায়, সরকার এমন একটা প্রতিষ্ঠান হিসাবে থাকুক, যার কাজ হবে, একদিকে পুঁজিপতিদের সমস্ত রকম সঙ্কট থেকে বাঁচানো, অন্যদিকে জনগণকে তীব্র শোষণ করার ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ না করা। অর্থাৎ পুঁজিপতিরা পেট্রল-ডিজেল-রান্নার গ্যাস-কেরোসিনের দাম ইচ্ছামত বাড়াবে — সরকার তাতে টুঁ শব্দটিও করতে পারবে না। এমন একটি ব্যবস্থা সরকার করে দিক — পুঁজিপতিরা তাই চাইছে।

পুঁজিপতিরা চাইছে, শ্রমের বাজারেও সংস্কার। শ্রমের বাজারে সংস্কার কথাটির অর্থ হল, (১) চাকরির স্থায়িত্ব বলে কিছু থাকবে না, হায়ার অ্যান্ড ফায়ার (নিয়োগ ও ইচ্ছামতো ছাঁটাই) নীতি কার্যকর করতে হবে, (২) ৮ ঘণ্টা শ্রমদিবস থাকবে না, ১২-১৫ ঘণ্টা শ্রমদিবস চালু হবে, (৩) পেনশন, গ্র্যাচুইটি, পি-এফ, ইএসআই ইত্যাদির সুযোগ থাকবে না, (৪) শ্রমিকস্বার্থে যে অধিকারগুলি রয়েছে, সেগুলি রাখা চলবে না, (৫) শ্রমআইন শিথিল করতে হবে, (৬) মালিকরা আইনভঙ্গ করলে শাস্তি দেওয়া চলবে না, (৭) শ্রমিকরা ইউনিয়ন করতে পারবে না, সংঘবদ্ধ হয়ে দাবিদাওয়া পেশ করতে পারবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সংস্কারগুলি — সবই শ্রমিকস্বার্থবিরোধী এবং মালিকদের স্বার্থে। কংগ্রেসকে দিয়ে পুঁজিপতিরা এই কাজগুলি করিয়ে নিতে চাইছে।

এই সংস্কারগুলি স্বাভাবিকভাবেই, জনগণের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়া তৈরি করবে, গড়ে উঠবে দেশব্যাপী প্রতিবাদ আন্দোলন। সেই কারণে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে সামাজিক দায়বদ্ধতার কথাও আনা হয়েছে। প্রণব মুখার্জী নাকি অর্থনৈতিক সংস্কারের সাথে সামাজিক দায়বদ্ধতার মিশেল দিয়ে ভারসাম্যের অসাধ্য সাধন করবেন। তিনি একাজে সফল হলে নিঃসন্দেহে প্রতারণার ক্ষেত্রে এক ধাপ এগিয়ে যাবেন। কিন্তু দুটো একসঙ্গে হয়না।

একটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিপতিদের স্বার্থ, আর আম-আদমির স্বার্থ একইসঙ্গে রক্ষা করা যায় না।পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যেটা চলে এবং এতদিন ধরে চলে আসছে, তাহল, দেশবাসীর স্বার্থরক্ষার নামে আসলে পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করা। ফলে আরও কর্মসংস্থান, আরও ভাতা, মানুষকে আরও সুরাহা দেওয়া ইত্যাদি যে কথাগুলি দেশের শাসকরা বলছে, তা আসলে সংস্কারের বিষক্রিয়ার ক্ষতস্থানে একটু মলমের প্রলেপ ছাড়া কিছু নয়।

এই প্রসঙ্গে সিপিএমের ভূমিকা লক্ষণীয়। সংবাদমাধ্যম ইদানিং বলতে শুরু করেছে, লোকসভায় সিপিএমের সাংসদ সংখ্যা কমে যাওয়ায় বিলগ্নিকরণের বিরুদ্ধে আর কোন বাধা থাকল না। এই প্রচার থেকে, যারা গভীরে বিচার করেন না, তাদের মনে হতে পারে, সিপিএম বোধ হয় বিলগ্নীকরণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নির্ভরযোগ্য শক্তি। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমের ভূমিকা লক্ষ করলেই দেখা যায়, বিলগ্নীকরণ, উদারীকরণ, বেসরকারীকরণের পথের শরিক তারাও। বিলগ্নীকরণের বিরোধিতার নামে কেন্দ্রীয় সরকারকে চাপ দিয়ে নানান লাভজনক পদ বা সুযোগসুবিধা আদায় করে নেওয়ার অঙ্ক তাদের মাথায় থাকতে পারে এবং সেজন্য কিছু কিছু বিরোধিতাও করতে পারে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সিপিএম যে উদারনীতিকেই অনুসরণ করছে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তা জানেন।

এরাজ্যে সিপিএম সাম্রাজ্যবাদী অর্থলগ্নি সংস্থা ডিএফআইডি থেকে ঋণ নিয়ে ছাঁটাইমুখী সংস্কার চালিয়ে যাচ্ছে। ২০০৫ সালের হিসাবে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সরকার ২৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় সংস্কার চালিয়ে প্রায় ৫০ শতাংশ কর্মী ছাঁটাই করেছে। গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলটিকে তারা বেসরকারি হাতে তুলে দিয়েছে। রাজ্যের ৬টি পরিবহন সংস্থা সহ আরও ২৩টি সংস্থা তাদের সংস্কারের তালিকায় রয়েছে। ফলে সিপিএম সংস্কারের বিরোধী, একথা আদৌ সত্য নয়। কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম প্রভৃতি যারাই সংসদীয় বুর্জোয়া রাজনীতির চর্চা করছে ,তারা সকলেই এ পথের পথিক। ফলে কেন্দ্রের নতুন সরকার সংস্কারের যে খড়্গ শ্রমিকশ্রেণীর উপর নতুন করে নামিয়ে আনছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে শ্রমিকশ্রেণীকেই। এস ইউ সি আই সাংসদ পার্লামেন্টে দলীয় লাইন অনুযায়ী এসবের বিরোধিতা করবে একথা ঠিক, কিন্তু একে আটকাতে হলে দেশব্যাপী গণআন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই।

চরম দুর্গতির সময়ে সাংসদকে পাশে পেয়ে অভিভূত মানুষ

ঘূর্ণিঝড় আয়লা যখন আছড়ে পড়ছে গোসাবা, বাসন্তী কুলতলি প্রভৃতি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তখন জয়নগরের নবনির্বাচিত সাংসদ ডাক্তার তরুণ মণ্ডল ক্যানিং এস ডি ও-র সঙ্গে বৈঠক করছেন ক্যানিং-এ ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়া আন্ত্রিক প্রতিরোধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। তারপর থেকে ১ জুন শপথ নিতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি বাসন্তী, গোসাবা, কুলতলির ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত এলাকাগুলির দুর্গত মানুষের পাশেই থেকেছেন। কখনও সরকার ও প্রশাসনের কাছে আরও ত্রাণের জন্য দরবার করতে কলকাতায় ফিরেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে যোগ দিয়েছেন, ত্রাণবরাদ্দ বৃদ্ধি ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন, আবার দুর্গত এলাকাগুলিতে ফিরে গেছেন।

ঝড়ের দিন বিকেলের মধ্যেই বিভিন্ন এলাকা থেকে বাঁধভাঙার এবং প্রবল ক্ষয়ক্ষতির সংবাদ আসতে থাকে। সাংসদ মণ্ডল দ্রুত ডি এম এবং এস ডি ও-র সাথে যোগাযোগ করে উদ্ধারকারী টিম, লঞ্চ প্রভৃতি পাঠানোর জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বলেন। ক্যানিং-এ মাতলা ১ ও ২ নং পঞ্চায়েতে তিনি নিজে গিয়ে উদ্ধারের কাজ তদারকি করেন। গভীর রাতে গোসাবার বিভিন্ন এলাকায় দুর্গত মানুষ কীভাবে টিনের চালে, গাছে, উঁচু জায়গায় আটকে আছে, তার খবর আসতে থাকে। তরুণবাবু এস পি এবং ডি এম-কে তৎক্ষণাৎ উদ্ধারকাজ চালানো যায় কি না, তার চেষ্টা করতে বলেন।

পরের দিন ২৬ মে ডাক্তার মণ্ডল বাসন্তী এবং গোসাবার বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছে যান। বাসন্তী বাজার, ভরতগড়, আনন্দাবাদ, ৩ ও ৪ নং গরাণ বোস, নফরগঞ্জ প্রভৃতি এলাকায় দুর্গত মানুষদের সঙ্গে দেখা করে দুরবস্থার কথা শোনেন। বাসন্তী বিডিওর সাথে বৈঠক করে মানুষের দুর্গতির কথা জানান এবং দ্রুত ত্রাণবরাদ্দ ও বণ্টনের দাবি জানিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক করে সর্বদলীয় কমিটি গঠন করে ত্রাণ বিতরণের প্রস্তাব দেন। তৃণমূল কংগ্রেস নেতা জয়ন্ত নস্কর, এস ইউ সি আইয়ের বৈদ্যনাথ বর, কান্তি দেবনাথ সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ তাঁর সাথে দুর্গত এলাকাগুলি ঘুরে দেখেন।

এরপর তিনি গোসাবা বিডিও অফিসে পৌঁছান। সেখানে তখন দুর্গত বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা শত শত মানুষ ত্রাণের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। ত্রাণের কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে জানতে গিয়ে দেখেন, বিডিও তখনও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ বা ত্রাণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর কথা রিপোর্টই করেননি। বিস্মিত ডাক্তার মণ্ডল তাঁকে এ বিষয়ে অবিলম্বে তৎপর হতে বলেন এবং সমস্ত স্তরে সর্বদলীয় কমিটি গঠন করতে বলেন। দেখা গেল, সামান্য চিঁড়ে-গুড় ছাড়া ব্যবস্থা কিছুই নেই। তাও নৌকার অভাবে দুর্গত এলাকাগুলিতে পাঠানো যাচ্ছে না। রাঙাবেলিয়া পঞ্চায়েতে দীর্ঘদিন ধরে প্রধান নেই। প্রশাসনিক গাফিলতিতে প্রধান নির্বাচন আটকে আছে। প্রধানের অনুপস্থিতিতে ত্রাণের সামগ্রী না পাওয়ায় বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন মানুষ। আগের রাত থেকে বন্যায় মৃত মানুষ এবং গবাদি পশুর স্তূপ হয়ে থাকা মৃতদেহ সরানো হয়নি বলে অভিযোগ জানাচ্ছেন তাঁরা। সাংসদ তরুণ মণ্ডল দুর্গত এই এলাকাগুলিতে দ্রুত ত্রাণ পাঠানোর তদারকি করেন। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জীর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে গোসাবা-বাসন্তী এলাকার সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন এবং ত্রাণ ও উদ্ধারের জন্য মিলিটারি ও হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানান।

দুর্গত মানুষদের চরম দুরবস্থার কথা সরকার ও প্রশাসনের উচ্চমহলে জানানোর জন্য তিনি ২৭ তারিখ কলকাতায় পৌঁছান। একদিকে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য চেষ্টা করতে থাকেন, অপরদিকে ত্রাণশিবিরগুলিতে অসুবিধা এবং অভাব-অভিযোগের খবর নিতে থাকেন, সাথে সাথে বিডিও, এসডিও, ডিএম-এর সাথে ক্রমাগত যোগাযোগ করে সে সব জানিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেন। ২৮ মে ডাক্তার মণ্ডল ও দলের প্রবীণ বিধায়ক দেবপ্রসাদ সরকার মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বলেন, আপনারা যে পরিমাণ বরাদ্দের কথা কলকাতা থেকে ঘোষণা করছেন, বাস্তবে তা দুর্গত এলাকাগুলিতে পৌঁছাচ্ছে না। ত্রাণবরাদ্দ ও পৌঁছানোর কাজ আরও দ্রুততার সঙ্গে করার জন্য তাঁরা যাতে প্রশাসনকে নির্দেশ দেন তার অনুরোধ করেন। দুর্গত এলাকায় পানীয় জল, ওষুধ ও ডাক্তার পাঠানো এবং স্থানীয় হাসপাতালগুলিকে ডাক্তার, নার্স ও ওষুধ পাঠিয়ে সচল করার জন্য তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ জানান। মৃতদের জন্য ৭ লক্ষ ও আহতদের জন্য ৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করারও দাবি জানান।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক সেরে ওই দিন বিকেলেই কমরেড তরুণ মণ্ডল কুলতলির জামতলায় পৌঁছান। সেখান থেকে গোপালগঞ্জের বিভিন্ন ত্রাণশিবির ঘুরে দেখেন। তাঁকে দেখে বহু জায়গায় মানুষ কান্নায় ভেঙে পড়েন। একদিকে নবনির্বাচিত সাংসদকে দেখার উচ্ছ্বাস, অন্যদিকে সর্বস্ব হারানোর বেদনা! সাংসদকে পেয়ে তাঁরা তাঁদের সর্বস্ব হারানোর কথা এবং কী অবর্ণনীয় অবস্থার মধ্যে তাঁরা দিন কাটাচ্ছেন, তার বিবরণ দেন। বলেন, দু'বেলা পেট ভরে খেতে পাচ্ছেন না, খাবার জল পাচ্ছেন না, গবাদি পশুর কোনও খাবার নেই, পানীয় জল নেই, অবিলম্বে পর্যাপ্ত সংখ্যক টিউবওয়েল না বসালে মহামারী শুরু হয়ে যাবে। কমরেড মণ্ডল তাঁদের বলেন, এক আনন্দময় পরিবেশে আপনাদের সাথে আমার দেখা হওয়ার কথা ছিল। অথচ আপনাদের এই চরম দুর্গতির মধ্যে আমি উপস্থিত হলাম। তিনি বলেন, ঘূর্ণিঝড়ের দিন থেকেই বাসন্তী, গোসাবা এলাকায় ছিলাম। তা সত্ত্বেও প্রতি মুহূর্তে আমি বিধায়ক দেবপ্রসাদ সরকার এবং জয়কৃষ্ণ হালদারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছি। প্রতিমুহূর্তে ডি এম-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে দ্রুত ত্রাণের ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলেছি। মুখ্যমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার কথাও তাঁদের জানান। বলেন, যাতে জমা জল দ্রুত বের করে দেওয়া যায়, পুকুরগুলি ব্যবহারযোগ্য করা যায়, প্রশাসনকে তার জন্য ব্যবস্থা নিতে বলবেন। তিনি বলেন, আমি একদিকে যেমন রাজ্য সরকারের সাথে যোগাযোগ করে ত্রাণবরাদ্দ বাড়ানো এবং তার সুষ্ঠু বণ্টনের জন্য চেষ্টা করছি, তেমনই দিল্লিতে তৃণমূল কংগ্রেসের যে সব বন্ধু এম পি হয়েছেন, মন্ত্রী হয়েছেন, তাদের সাথে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বরাদ্দবৃদ্ধির চেষ্টা করছি। তিনি বলেন, আমি রেলমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর সঙ্গেও সব সময় যোগাযোগ রাখছি, যাতে রাজ্যের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বরাদ্দও বাড়ানো যায়। তিনি বলেন, যাঁদের ঘর ভেঙে গেছে, যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাঁরা যাতে মাথা উঁচু করে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেন, আবার নতুন করে সব কিছু গড়ে তুলতে পারেন, তার জন্য আমি সমস্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব। তিনি বলেন, দু'হাজার, তিন হাজার টাকার অনুদান নয়, পরিবার নিয়ে বসবাস করার জন্য বাড়ি নির্মাণ করতে যে পরিমাণ খরচ হবে, তার সমস্ত খরচ যাতে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার মিলে বহন করে আমি তার দাবি জানাব।

২৯ মে সকাল থেকে ডাক্তার মণ্ডল মৈপীঠের বিভিন্ন ত্রাণশিবিরি পরিদর্শন করেন। নগেনাবাদের বোসের ঘেরি এলাকায় দুর্গত মানুষ ত্রাণ বিতরণে সিপিএম পরিচালিত বিরুদ্ধে দলবাজির অভিযোগ জানান। হুকাহারানিয়া, ভাসাগুড়গুড়িয়া প্রভৃতি এলাকার ত্রাণশিবিরগুলিতে তিনি মানুষের অভাব-অভিযোগের খোঁজ নেন এবং সেইমতো প্রশাসনকে অবহিত করেন। ভুবনেশ্বরীতে সাংসদ মণ্ডলের গাড়ির সামনে শুয়ে পড়ে গাড়ি আটকান দুর্গত মানুষেরা। বলেন, আমাদের অভিযোগ আপনাকে শুনতে হবে। দুর্গতির কথা বলতে কান্নায় গলা বুজে আসে তাঁদের। কমরেড মণ্ডল তাঁদের বলেন, রাজ্যে এক অমানবিক সরকার রাজত্ব করছে। আর্ত মানুষের কান্না তাদের কানে পৌঁছায় না, হাহাকার তারা শুনতে পায় না। প্রয়োজনে আপনাদের সংগঠিতভাবে দাবি আদায় করতে হবে।

৩০ মে সরকারি ত্রাণের অপ্রতুলতা ও সিপিএমের দলবাজির প্রতিবাদে এস ইউ সি আইয়ের পক্ষ থেকে কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দেন সাংসদ ডাক্তার তরুণ মণ্ডল। ৩১ মে আবার তিনি গোসাবায় ফিরে বিডিওর সঙ্গে দেখা করেন। পরিস্থিতির বিবরণ শুনে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। সেখান থেকে গোসাবার ত্রাণশিবিরে যান, গোসাবা বাজারে দোকানে দোকানে গিয়ে সকলকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে অনুরোধ করেন। সেখান থেকে সোনাগাঁ, বালি বিদ্যামন্দির এলাকায় গিয়ে খোঁজখবর নেন। সাতজেলিয়ার দয়াপুর ঘুরে দেখেন। তারপর ৭ কিমি হেঁটে রজতজুবিলি স্কুলে পৌঁছান। যাওয়ার পথে বিভিন্ন জায়গায় দুর্গত মানুষদের অভিযোগ শোনেন। বিপন্ন মুহূর্তে সাংসদকে কাছে পেয়ে এলাকার মানুষ অভিভূত হন। বলেন, আপনি আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, এতেই আমরা খুশি। এর আগে কখনও এমন ঘটেনি। প্রত্যুত্তরে সাংসদ বলেন, যতটুকু ত্রাণ বরাদ্দ হচ্ছে, তাও শেষপর্যন্ত এসে পৌঁছাচ্ছে না। আরও বলেন, প্রশাসন বৈঠক করছে, অথচ আমাকে জানাচ্ছে না। তারা একমুখে সকলের সহযোগিতার কথা বলছে, অথচ কাজে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলছে। এর বিরুদ্ধে সকলকে সোচ্চার হতে হবে। আপনারা সর্বদলীয় কমিটিগুলি গড়ে তুলুন, বরাদ্দ আদায় করে নিন। আমার সমস্তরকম সহযোগিতা পাবেন। তিনি বলেন, আমি শপথ নেওয়ার জন্য আগামীকাল দিল্লি যাচ্ছি,

সাতের পাতায় দেখুন

নিমপীঠে ত্রাণশিবিরে দুর্গত মানুষদের সাথে কথা বলছেন সাংসদ কমরেড তরুণ মণ্ডল

ত্রাণ ও পুনর্বাসনের দাবিতে জয়নগরে হাজার হাজার দুর্গত মানুষের বিক্ষোভ

প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় ও বৃষ্টিতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার অন্যান্য অংশের মতো জয়নগর ২নং ব্লকেও প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। হাজার হাজার ঘর হয় সম্পূর্ণভাবে, নয় তো আংশিকভাবে ভেঙে পড়েছে। ফলের বাগান ও অন্যান্য অর্থকরী গাছ হাজারে হাজারে ধ্বংস হয়েছে। নলগোড়া, চুপড়িঝাড়া ও মণিরতট নদী বাঁধ ও রিং রোড ভেঙেছে। ব্লকের ১০টি অঞ্চলের হাজার হাজার খেতমজুর ও অন্যান্য পেশার সাধারণ মানুষ সহায়-সম্বল হারিয়ে দু'দিন ধরে অভুক্ত থেকেছে। শত শত মানুষ খোলা আকাশের নিচে থেকেছে। এই দুর্গত মানুষরাই ২৬ মে দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত বিডিও অফিসকে কার্যত ঘেরাও করে রাখে। কমরেড সুকুমার হালদার, আনসার সেখ, খালেখ মোল্লা, মোবারক মোল্লা, প্রদীপ সরকার, স্বপন প্রামাণিক ও শশধর মিস্ত্রির নেতৃত্বে বিডিও-র কাছে ডেপুটেশন দেন। দীর্ঘসময় আলাপ-আলোচনার পর বিডিও প্রভূত পরিমাণে ত্রিপল, শুকনো খাবার ও পরবর্তীকালে জি আর এবং গৃহ অনুদানের ব্যবস্থা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় করার আশ্বাস দেন।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, কমরেডস আনসার সেখ, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রূপম চৌধুরী ও সুজাতা ব্যানার্জী। চুপড়িঝাড়া, নলগোড়া এবং মণিরতটের নদীভাঙন দেখার জন্য পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতার নেতৃত্বে খাদ্য, শিক্ষা ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষগণ ২৭ মে প্লাবিত অঞ্চলে যান। সেখানে তাঁরা দেখেন, ১৫৬টি পরিবার পূর্ব রাধাবল্লভপুরে তিন দিন জলবন্দী, খাদ্য, পানীয় কিছুই নেই। সিপিএম পরিচালিত পঞ্চায়েত তাদের খোঁজখবর নেয়নি। কোনও ত্রাণও দেয়নি।

২৮ মে প্রায় ব্লকে প্রায় তিন শতাধিক মানুষ আসেন এবং বিডিওকে ডেপুটেশন দেন। তাঁরা জানান, চুপড়িঝাড়া ও নলগোড়ার সিপিএম পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ত্রাণ নিয়ে দলবাজি করছেন এবং প্রকৃত দুর্গতরা ত্রাণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তাঁরা বিডিওর কাছে পর্যাপ্ত ত্রাণের দাবি জানান। বিডিও তাঁদের দাবি মেনে নিয়ে চাল ও ত্রিপল বরাদ্দ করেন এবং অন্যান্য দাবি দ্রুত পূরণের আশ্বাস দেন।

নামখানা

নামখানা ব্লকের ৭টি পঞ্চায়েতের মধ্যে ৬টিই ঝড় ও লোনাজলের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত। তার মধ্যে মৌসুনি পঞ্চায়েতের তিনভাগ, নারায়ণপুর ও হরিপুর পঞ্চায়েত দু'টির অর্ধেকটি লোনাজলের তলায়। বিডিও-র সঙ্গে দুর্গত মানুষদের জন্য ত্রাণ ও নদীবাঁধ অবিলম্বে উপযুক্তভাবে মেরামতের দাবি নিয়ে আলোচনায় বসেছে এস ইউ সি আই এবং নামখানা ব্লক নাগরিক কমিটি। ঈশ্বরীপুরের বিপন্ন গ্রামবাসীদের নিয়েও বিডিও-র সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু বিডিও তাঁর সীমিত সামর্থ্যের কথা জানিয়ে সেইমতো কাজ করতে শুরু করেছেন।

ত্রাণের পাশাপাশি অবিলম্বে বাঁধ মেরামতির দাবিতে সোচ্চার কুলতলির মানুষ

একের পাতার পর

কাছে পৌঁছে যেতে পারত। যে তৎপরতা কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার দেখাতে পারেন, এলাকায় এলাকায় এস ইউ সি আই নেতা-কর্মীরা দেখাতে পারেন, তা অনেক বেশিই করতে পারত একটা দরদী সরকার ও তার প্রশাসন। কিন্তু এই পরিস্থিতি মোকবিলার জন্য যে পরিকাঠামোর দরকার ছিল, গত ৩২ বছরে সরকার তার কিছুই করেনি।

ক্রমাগত আবেদন ও কাকুতি-মিনতি সত্ত্বেও ঝড়ের চারদিন পরেও এই অপদার্থ প্রশাসন ত্রাণশিবিরগুলিতে সামান্য পরিমাণ চাল-ডাল পাঠানো ছাড়া আর কিছুই করেনি। তাও সব জায়গায় পৌঁছায়নি। বহু জায়গায় স্থানীয় মানুষ নিজেরাই

মাতলার ভেঙে যাওয়া বাঁধ মেরামতির কোনও উদ্যোগই এখনও নেওয়া হয়নি

উদ্যোগ নিয়ে দুর্গত অভুক্ত মানুষদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছেন। গোপালগঞ্জের কাছারির মোড়ে এমনই একটি শিবির চালাচ্ছেন সহদেব মণ্ডল, রতন নস্কর, কানন হালদাররা। তাঁরা জানালেন, এলাকার নিরানব্বই শতাংশ মানুষেরই বাড়ি, রান্নাঘর, গোয়ালঘর ভেঙে গেছে। শাকসব্জির বাগান, কলা, পেঁপে, সবেদা, নারকেল সহ বেশিরভাগ গাছই উপড়ে পড়েছে। পুকুরগুলিতে লোনা জল ঢোকায় সমস্ত মাছ মরে গেছে। জল সরানোর কোনও ব্যবস্থা না থাকায় জল পচে বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছে। সেই বিষাক্ত জলের থেকে সৃষ্ট দূষিত গ্যাসের জন্য রোগ ছড়াচ্ছে। ওষুধের ব্যবস্থা নেই। পানীয় জলের জন্য চলছে হাহাকার। যে ক'টি টিউবওয়েল ছিল, সেগুলিও অকেজো হয়ে গেছে। সেগুলি সারানোর কোনও উদ্যোগ প্রশাসনের স্তরে নেই। বেশিরভাগ জায়গায় রিলিফ যা আসছে, তাতে মানুষকে পেট ভরে খেতে দেওয়া যাচ্ছে না। বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে পড়ায় দুর্গত এলাকার কোথাও বিদ্যুৎ নেই। সরকার বিনামূল্যে কেরোসিন দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেও বাস্তবে কোথাওই তা দেওয়া হচ্ছে না। নিকষ অন্ধকারে বাস করছেন মানুষ। গোটা এলাকা জুড়ে বিষধর সাপের উপদ্রব চলছে। সরকারি মন্ত্রী এবং আমলারা কলকাতায় বসে টিভি-খবরের কাগজে ঘোষণা করে চলেছেন ৬৫টি মেডিকেল টিম কাজ করছে, বাস্তবে কুলতলির বিস্তীর্ণ এলাকার কোথাও তাদের দেখা মেলেনি। প্রতিবেদক ২৭-২৯ মে, তিনদিনে প্রতিটি এলাকায় ঘুরে কোথাও মেডিকেল টিমের দেখা পাননি। বরং স্থানীয় গ্রামীণ ডাক্তাররাই উদ্যোগ নিয়ে যতটুকু পেরেছেন, দুর্গত মানুষের চিকিৎসা করেছেন।

কৈখালিতে মাতলার বাঁধের গায়ে বাস ছিল বিষ্ণুপদ মণ্ডলের। মাতলায় মাছ ধরেই ৭-৮ জনের সংসার চালাতেন। জলোচ্ছ্বাসে নৌকা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, জাল ছিঁড়ে ফালাফালা। বললেন, ত্রাণশিবিরে আছি। এক ফোঁটাও জমি নেই। সরকার সাহায্য না করলে ভিক্ষে করা ছাড়া উপায় থাকবে না। একই অবস্থা নিমাই নস্করের। ঘর, গোয়াল সব ধসে পড়েছে। ভ্যান চালিয়ে সংসার চালাতেন। দেওয়াল চাপা পড়ে সেটিও চুরমার। কী করে সংসার চালাবেন, সেই চিন্তাতেই অস্থির হয়ে উঠেছেন।

কৈখালি, মেরিগঞ্জের ডোঙাজোড়া, গোপালগঞ্জের গরাণকাঠি এলাকা, দেউলবাড়ি, ভাসাগুড়গুড়িয়া, মৈপীঠ, নগেনাবাদ সর্বত্রই নদীবাঁধ ভেঙে মানুষের সর্বস্ব ভেসে গিয়েছে। এলাকার মানুষ প্রবল আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন, কোটাল এলেই আবার বানভাসি হবেন তাঁরা। এই বাঁধ মেরামতি তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, জানিয়ে দিয়ে দায়িত্ব শেষ করেছে রাজ্য সরকারের সেচ দপ্তর। তা হলে মিলিটারি - বিএসএফকে দিয়ে যথার্থই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এ কাজ করা হল না কেন? কেন আবার কোটালের জলে সমস্ত এলাকাপ্লাবিত হতে দেওয়া হচ্ছে? অথচ বাঁধ মেরামত করে, কোথাও প্রয়োজনে বাঁধ কেটে লোনা জল বের করে দিতে না পারলে বর্ষাতে কোথাওই চাষ হবে না, পুকুরের লোনা জল বের করে মিষ্টি জল না ভরলে সেগুলি যেমন ব্যবহার করা যাবে না, তেমনই নতুন করে মাছেরও চাষ হবে না। দ্রুত চাষের কাজ শুরু করতে না পারলে মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না। বাস্তবিক, সরকারের ৩২ বছরের চূড়ান্ত অকর্মণ্যতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বন্যা মোকাবিলা, উদ্ধার ও ত্রাণের কাজে এই চূড়ান্ত ব্যর্থতা— যা ক্ষমাহীন অপরাধ ছাড়া আর কিছু নয়।

কুলতলির বিধায়ক কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার ২৫ মে বিকাল থেকেই দলের কর্মীদের নিয়ে ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। ২৬ মে নিমপীঠে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের সংবাদ পেয়ে জয়নগরের বিধায়ক দেবপ্রসাদ সরকার ও তিনি বিনা আমন্ত্রণেই উপস্থিত হয়ে জরুরিকালীন তৎপরতায় ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজ শুরু করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি জানান। তিনি কুলতলিকে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার তালিকাভুক্ত করার দাবি জানালে প্রথমে প্রশাসন তা মানতে অস্বীকার করে, কিন্তু চাপের সামনে শেষপর্যন্ত তা মানতে বাধ্য হয়। পরের দিন তিনি বিডিওর সাথে সর্বদলীয় বৈঠকে ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা পেশ করেন, অবিলম্বে বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু করতে বলেন। ত্রাণ নিয়ে যাতে কোনও দলবাজি, দুর্নীতি না হয় তার জন্য ব্লক ও পঞ্চায়েত স্তরে সর্বদলীয় কমিটি করার প্রস্তাব দেন। প্রস্তাবের বিরুদ্ধে শাসক সিপিএম নেতারা সোচ্চার হলেও কমরেড হালদারের অনমনীয় মনোভাবে এবং উপস্থিত অন্য দলগুলির সমর্থনে শেষপর্যন্ত প্রশাসন প্রস্তাবটি মেনে নেয়।

২৮ মে কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার গোপালগঞ্জ, গোদাবরকুন্দখালি, মেরিগঞ্জ, দেউলবাড়ির বিস্তীর্ণ এলাকার ভাঙা নদীবাঁধগুলি কোথাও হাঁটু পরিমাণ কাদা, কোথাও কোমরজল ভেঙে পরিদর্শন করেছেন, এলাকার দুর্গত মানুষের অভিযোগ শুনেছেন, যেখানে ত্রাণ পৌঁছায়নি বা নামমাত্র পৌঁছেছে, বিডিওর সঙ্গে তখনই টেলিফোনে কথা বলে তা দ্রুত পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছেন। যখনই শুনেছেন কৈখালি ক্যাম্পে দুর্গতদের একবার মাত্র খাবার দেওয়া হচ্ছে, তখনই সেখানে ছুটে গিয়ে বিডিওর সাথে কথা বলে তিনবার খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। কমরেড হালদার বলেন, গোটা গ্রীষ্মকাল জুড়ে বাঁধের দুর্বল অংশগুলি যদি মেরামত করা হত, যেগুলিতে মেরামতি চলছিল সেগুলি যদি সময়মতো শেষ করা হত, তবে বাঁধগুলি অনেকখানিই রক্ষা করা যেত। তিনি বলেন, বাঁধগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়িত্ব যাদের, সেই সেচদপ্তরের অপদার্থতা চূড়ান্ত। দুর্গত মানুষরা নানা অভিযোগের কথা জানালে তিনি বলেন, আমলাতন্ত্র নির্ভর অপদার্থ সরকারি ব্যবস্থায় যতটুকুও বরাদ্দ হয়েছে, তাও ঠিকঠিক মতো পৌঁছাবে না, যদি আপনারা সক্রিয় উদ্যোগ না নেন। প্রয়োজনে বিক্ষোভ দেখিয়ে, বিডিওকে ঘেরাও করে বরাদ্দ নিয়ে আসতে হবে, প্রশাসনকে সক্রিয় করতে হবে। তিনি বলেন, সিপিএম পরিচালিত পঞ্চায়েতগুলি ত্রাণবণ্টনে সর্বদলীয় কমিটি করতে যেখানে রাজি হবে না, সেখানেই আপনারা সংগঠিতভাবে তা করতে বাধ্য করবেন।

সাংসদ তরুণ মণ্ডলও কুলতলি এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঘুরে দেখেন ও দুর্গত মানুষের অভিযোগ শোনেন।

রাজ্য জুড়ে লাগাতার ত্রাণসংগ্রহে এস ইউ সি আই কর্মীরা

সর্বত্রই দুর্গত মানুষদের ত্রাণে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এস ইউ সি আই কর্মীরা। ২৬ মে থেকে রাজ্যজুড়ে ত্রাণসংগ্রহ চলছে। হাট-বাজার, স্টেশন-গঞ্জে, পাড়ায়, স্কুল-কলেজে, অফিস-আদালতে সর্বত্রই এই কর্মসূচি চলছে। সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষ গভীর সহানুভূতি নিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। সংগৃহীত অর্থ, বস্ত্র, ওষুধ সবকিছুই দুর্গত এলাকাগুলিতে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। দুর্গত এলাকায় চিকিৎসা শিবির চালাচ্ছেন দলের মেডিকেল ইউনিটের ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। প্রয়োজন আরও সাহায্যের। আমাদের আশা, রাজ্যের মানুষ এস ইউ সি আই কর্মীদের হাতে যত বেশি সম্ভব ত্রাণ সাহায্য তুলে দেবেন।

ত্রাণশিবির তদারকিতে বিধায়ক কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার

পাথরপ্রতিমায় দুর্গতদের ত্রাণে সরকারি উদাসীনতা ও অপদার্থতা চরমে

পাথরপ্রতিমা থানা এলাকার ১৫টি পঞ্চায়েতের মধ্যে ১৩টিই ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে ও নদীবাঁধ ভেঙে লোনাজলের বন্যায় বিপর্যস্ত। তার মধ্যে ৯টি পঞ্চায়েতের ৯০ শতাংশ এলাকাই লোনাজলের তলায়। ২০ হাজারের বেশি ঘর-বাড়ি মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছে। ব্লকের ৫০-৬০ কিমি-র বেশি নদীবাঁধ প্রায় অবলুপ্ত। ৩০-৩২ বছর আগে তৈরি এই নদীবাঁধ সংস্কারের অভাবে জীর্ণ হয়েই ছিল। নদীবাঁধ স্থায়ীভাবে মেরামতের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে এস ইউ সি আই এবং ব্লক নাগরিক কমিটি আন্দোলন করে যাচ্ছে।

ঝড়ের প্রথম চারদিনে সরকারের ত্রাণকার্য বলতে তিনটি এনজিও-কে দিয়ে কোথাও কোথাও দুর্গত মানুষদের মাথাপিছু ১০০ গ্রাম চিঁড়ে বা খানিকটা মুড়ি দেওয়া। চারটি এলাকায় ৬-৮ বস্তা করে খাদ্য বস্তায় ভরে হেলিকপ্টার থেকে ফেলা হয়েছিল। জলেই সে সব ভেসে গেছে। পলিথিনের পাউচে করে কিছু খাওয়ারও ফেলা হয়েছিল, তার অধিকাংশই ফেটে নষ্ট হয়েছে। চারদিন পর অঞ্চল প্রতি ২০-৩০টি করে ত্রিপল পাঠিয়েছে প্রশাসন, যেখানে এক-একটি অঞ্চলে প্রায় দু'হাজার বাড়ি নিশ্চিহ্ন। পানীয় জলের টিউবওয়েল এমনিতেই প্রয়োজনের তুলনায় কম ছিল। এখন তার অধিকাংশই নষ্ট। ৩০ মে বিডিও অফিসে বৈঠক করলেন ডি এম-এর প্রতিনিধি। ত্রাণের কাজে সকলের সহযোগিতা চাইলেন। কিন্তু, সরকার ও তার প্রশাসন এই ব্লকের দুর্গত মানুষদের জন্য কী কী দেবেন, সেটাই বলতে পারলেন না।

প্রতিটি অঞ্চলে ৬-৭টি শিবির করে এলাকার মানুষই বিপন্ন মানুষদের সামান্য খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। অবিলম্বে নদীবাঁধ বাঁধার দাবিতে এলাকায় এলাকায় মানুষ বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। জি প্লট এলাকার গণকমিটি ইরিগেশন দফতরের কর্তাদের এলাকায় ধরে এনে অবিলম্বে নদীবাঁধ সারানোর দাবি মানতে বাধ্য করেছেন। গোপালনগরে রাস্তা সারানোর দাবিতে অবরোধ-বিক্ষোভ চলছে।

ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধ প্রসঙ্গে

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

উত্তেজনার পারদ চড়তে থাকে। ১৯৫৯-এর অক্টোবরে ভারতীয় অগ্রগামী টহলদার সেনারা পশ্চিম রণাঙ্গনে লেহ্-এর উত্তরপূর্বে বিতর্কিত এলাকার মধ্যে কংগা গিরিপথে একটি সেনাচৌকি বসানোর চেষ্টা করে। এই গিরিপথে আগে থেকেই চীনের সেনাচৌকি ছিল। ২০ অক্টোবর সেখানেই গোলাগুলি বর্ষণে নয় জন ভারতীয় জওয়ান নিহত ও সাত জন বন্দি হন। চীনের সেনাবাহিনীরও বড়রকম ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই ঘটনার পরই, স্বাভাবিকভাবে, ভারতের অভ্যন্তরে 'চীনা আগ্রাসনের' আওয়াজ আবার সোচ্চার হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এর প্রতিধ্বনি ওঠে।

এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চৌ এন-লাই এক জরুরি শীর্ষবৈঠক ডাকেন। নেহরু গোড়ায় অনিচ্ছুক হলেও শেষপর্যন্ত ১৯৬০ সালের এপ্রিলে দিল্লিতে চীনের প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানান। চৌ এন-লাই দিল্লিতে আসেন। বর্মার সঙ্গে চীনের আরও পুরনো ও আরও জটিল সীমান্ত সমস্যা চুক্তির মধ্য দিয়ে সমাধানে সক্ষম এবং ম্যাকমোহন লাইনের চীন-বর্মা সীমানার বিতর্কিত অংশের ফয়সালা করায় সফল, চৌ এন-লাই তখন খুবই আশাবাদী।

দিল্লির আলোচনা শেষে তিনি আলোচনার সারাংশ হিসাবে ছ'টি পয়েন্ট নির্দিষ্ট করেন, যেগুলিতে উভয়পক্ষ একমত। তিনি দেখান, একটি প্রকৃত সীমান্তরেখা (লাইন অব অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল) রয়েছে, যে রেখা পর্যন্ত উভয় দেশই নিজের প্রশাসনিক এক্তিয়ার আছে মনে করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, উভয় দেশই মনে করে, সীমান্ত নিয়ে বিরোধ আছে। যতদিন না বিরোধের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়, ততদিন দু'পক্ষই প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা মেনে চলবে এবং আলোচনার পূর্বশর্ত হিসাবে কোনও ভূখণ্ডের দাবি তুলবে না। 'সীমান্তে শান্তি বজায় রেখে' আলোচনা চালাবার জন্য সীমান্তের বিতর্কিত এলাকায় কোনওপক্ষই টহলদারি চালাবে না। চৌ এন-লাই আবারও বলেন, কীসের ভিত্তিতে সীমান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি হবে, তা নিয়ে বোঝাপড়া হয়েই আছে। এই ভিত্তি নির্ধারণের সময়ে যেগুলিকে বিবেচনার মধ্যে নেওয়া হয়েছে, তা হল, জলবিভাজিকা, নদী-উপত্যকা, গিরিপথ প্রভৃতি ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য এবং হিমালয় ও কারাকোরাম পর্বত সম্পর্কে দু'দেশের জনগণের জাতীয় অনুভূতি। এর সাথে আঞ্চলিক অধিবাসীদের ভাষা, তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাস ইত্যাদিকেও বিবেচনায় নিতে হবে। এছাড়াও এই সভায় চীন প্রথম সুস্পষ্টভাবে তাদের প্রস্তাবে বলে, বিতর্কিত দুই সেক্টরে এবং বর্ডার কমিশনের কর্মক্ষেত্র নির্ধারণে বিদ্যমান বাস্তবকে স্বীকার করেই উভয়পক্ষকে এগোতে হবে (দ্রঃ টাইমস্ অব ইন্ডিয়া, ২১.৪.৬০)। এর মানে দাঁড়ায়, পূর্ব সেক্টরে চীনের ম্যাকমোহন লাইনকে মেনে নেওয়া, এবং...আকসাই চীনের ওপর ভারতের দাবি ছেড়ে দেওয়া (দ্রঃ ইন্ডিয়াজ চায়না ওয়ার পৃঃ ১৬২)। গ্রেভার তাঁর প্রবন্ধেও একই কথা লিখেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে চৌ এন-লাই বলেন, নেহরু পূর্বের স্বীকৃত পয়েন্ট মানতে রাজি হচ্ছেন না। অর্থাৎ, ভারত চূড়ান্ত মীমাংসা সাপেক্ষে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা মানতে রাজি নয়, বরং ভারত যে ভূখণ্ডের দাবি করছে, নেহরু সেই দাবিতেই অনড়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই শীর্ষবৈঠক ব্যর্থ হয়।

দিল্লি শীর্ষবৈঠকে দু'পক্ষের সেনা টহলদারি স্থগিত রাখার প্রস্তাব নেহরু খারিজ করেন। স্থিতাবস্থা বজায় রাখার বদলে ভারত সরকার ও ভারতীয় সেনা তাদের 'ফরোয়ার্ড পলিসি' নিয়ে এগোতে থাকে। 'ফরোয়ার্ড পলিসি' হল, টহলদারির নামে চীনের ভূখণ্ডে আরও ঢুকে পড়া এবং সেখানে সেনাচৌকি বসানো। এর উদ্দেশ্য হল, চীনের ওপর চাপ বাড়ানো, যাতে ভবিষ্যত সমঝোতা বৈঠকে দরকষাকষির ক্ষমতা বাড়ানো যায়। এরকম ৬০টি চৌকি ভারত তৈরি করেছে, যার মধ্যে ৪৩টিই ম্যাকমোহন লাইনের উত্তরে। (সূত্র ঃ ইন্ডিয়াজ চায়না ওয়ার এবং এ জি নুরানি রচিত ফ্যাক্ট অফ হিস্ট্রি, ইন্ডিয়াজ ন্যাশনাল ম্যাগাজিন, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৩)। ''(চীনের) বিদেশমন্ত্রী মার্শাল চেন-ঈ এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে বলেন,''ভারতের ফরোয়ার্ড পলিসি হল একটা ধারালো ছুরি, যেটা ভারত আমাদের বুকে বসাতে চায়। কিন্তু আমরা তো চোখ বুজে মরার জন্য বসে থাকতে পারি না। ... চীনের নেতৃত্ব মনে করে, সীমান্ত বিরোধের ক্ষেত্রে তাঁদের সংযত আচরণকে ভারত দুর্বলতা মনে করছে। তাই তারা ক্রমাগত প্ররোচনা সৃষ্টি করছে, কাজেই পরিকল্পিত ভারতীয় আগ্রাসন রুখে দিতে দরকার ছিল জোরালো পাল্টা প্রত্যাঘাত।'' (চায়নাজ ডিসিশন ফর ওয়ার উইথ ইণ্ডিয়া ইন ১৯৬২, জন গ্রোভার)।

ফরোয়ার্ড পলিসির অঙ্গ হিসাবে ১৯৬২-র জুনে ভারতের সেনাবাহিনী থুগ লা গিরিশিরার নিচে অবস্থিত নামকা চু নদীর কাছে একটা সেনাচৌকি বসায়। এর উদ্দেশ্য হল, ম্যাকমোহন লাইনের উত্তরে গুরুত্বপূর্ণ স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্ট এই গিরিশিরাটি দখল করা। এর পর, ২২ জুলাই ভারত ফরোয়ার্ড পলিসি সম্প্রসারিত করে এবং সমস্ত বিতর্কিত এলাকায় আগে থেকেই চীনের যে সেনারা ছিল, ভারতীয় সেনারা তাদের মেরে তাড়িয়ে দেয়। (দ্রঃ হিস্ট্রি অফ দি কনফ্লিক্ট উইথ চায়না ১৯৬২, পি বি সিনহা, অ্যাথালে, ও প্রধান সম্পাদক এস এন প্রসাদ। হিস্ট্রি ডিভিশন, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, ভারত সরকার)। ১৯৬২-র অক্টোবরের মধ্যে এই ফরোয়ার্ড পলিসি সীমান্তের পশ্চিম সেক্টরে দারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি করে। ১২ অক্টোবর ''নেহরু সাংবাদিকদের সামনে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, ভারতীয় সেনাবাহিনীকে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন 'আমাদের দেশের মাটি দখলমুক্ত করে', অর্থাৎ, ভারতের দাবি আদায় করতে আক্রমণে যায়''। (দ্রঃ নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউনে 'চীনের বিরুদ্ধে নেহরুর যুদ্ধ ঘোষণা' শীর্ষক সম্পাদকীয়)।

বাস্তবে, 'দেশের মাটি দখলমুক্ত' করার অভিযান ইতিমধ্যেই নেহরু সরকার পূর্ব সেক্টরে থুগ লা গিরিশিরায় মুখোমুখি সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে শুরু করেছিল। ৯ অক্টোবর নেহরু রেডিওযোগে ''গিরিশিরা থেকে চীনাদের তাড়াও''— এই আদেশ দেন। আদেশ অনুযায়ী ভারতীয় ফৌজ থুগ লা গিরিশিরা আক্রমণ করে, কিন্তু চীনাদের কাছে তারা পরাস্ত হয়ে পিছু হঠে। ২০ অক্টোবর চীনা সেনাবাহিনী (তখনকার নাম গণমুক্তি ফৌজ বা পি এল এ), ১০০০ কিলোমিটার ব্যবধানে দুটি রণাঙ্গনে আক্রমণ হানে। একদিকে, পশ্চিম রণাঙ্গনে আকসাই চীনের চিপ চাপ উপত্যকা থেকে পি এল এ ভারতীয় সেনাদের পিছু হটতে বাধ্য করে; অন্যদিকে, পূর্ব রণাঙ্গনে নামকা চু নদীর দুই তীরই পি এল এ দখল করে নেয়। সিকিমের নাথু লা গিরিপথেও কিছু সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। চারদিন জোর লড়াইয়ের পর চীনের সেনাবাহিনী উল্লেখযোগ্য সাফল্য পায়। পূর্ব রণাঙ্গনে,আগে ভারতের প্রশাসনিক এক্তিয়ারের মধ্যে ছিল, এমন বিতর্কিত এলাকা সহ সমস্ত বিতর্কিত এলাকার ভালো অংশ তারা দখল করে। চীনা সেনাবাহিনীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সীমান্ত পেরিয়ে দক্ষিণে ষোল কিলোমিটার ঢুকে পড়ে। ভারতীয় ফৌজ পিছু হঠে আরও সুরক্ষিত ঘাঁটি, সে লা ও বমডি লা-তে আশ্রয় নেয়। চারদিন যুদ্ধের পর তিন সপ্তাহ যুদ্ধে ঢিলা পড়ে। চৌ এন-লাই সেনাবাহিনীকে থামার নির্দেশ দেন।

২৪ অক্টোবর সীমান্ত সংঘাত বন্ধ করার উদ্দেশ্যে চীন সরকার তিনসূত্রের এক প্রস্তাব আনেন। এর দ্বারা আবার শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সীমান্ত বিরোধ মেটানোর রাস্তা নতুন করে খুলে যায়। চৌ এন-লাই ব্যক্তিগতভাবে নেহরুর কাছে আবেদন করেন ও যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেন। চীনা প্রস্তাবে বলা হয়, শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার পথেই যে চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ মেটান দরকার, তা দু'পক্ষকেই নিশ্চিতভাবে বলতে হবে। চীন সরকার আশা প্রকাশ করে যে, যতদিন না সীমান্ত বিরোধের চূড়ান্ত মীমাংসা হচ্ছে, ততদিন ভারত সরকার বিদ্যমান প্রকৃত সীমান্তরেখা (লাইন অব অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল) মেনে চলবে। উভয়পক্ষই এই সীমান্তরেখা থেকে নিজ নিজ সেনাবাহিনীকে কুড়ি কিলোমিটার দূরে সরিয়ে নেবে ও যুদ্ধের পথে যাবে না। চীনের প্রস্তাবে আরও বলা হয়, ভারত সরকার যদি চীনের উপরোক্ত প্রস্তাবে রাজি হয়, তবে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ভিত্তিতে চীন পূর্ব রণাঙ্গনে তার সেনাবাহিনীকে লাইন অব অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোলের আরও উত্তরে (অর্থাৎ চীনের দিকে) সরিয়ে নেবে, সাথে সাথে উভয় পক্ষকেই স্বীকার করতে হবে, তারা কেউই লাইন অব অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল, অর্থাৎ মধ্য ও পশ্চিম ভাগের পরম্পরাগত লাইন লঙঘন করবে না। চীন সরকার তার প্রস্তাবে আরও বলে, বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে সীমান্ত বিরোধ সমাধানের জন্য উভয় পক্ষের সম্মত কোনও স্থানে দু'দেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ''পুনরায়'' আলোচনা শুরু হওয়া দরকার। প্রস্তাবের ব্যখ্যায় চীন সরকার বলে, প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বলতে তারা, সংঘর্ষ ও জটিলতা সৃষ্টি হওয়ার আগে যেখানে সীমান্তরেখা ছিল, সেই রেখাকেই বোঝাচ্ছে; যে রেখার কথা তারা ১৯৫৯ সালের ঘোষণায় ও ১৯৬০ সালে দিল্লীর আলোচনায় বলেছে। দেখা যাচ্ছে, ২৪ অক্টোবর ১৯৬২-তে চীনের অবস্থান অনেক সুবিধাজনক হওয়া সত্ত্বেও এবং ম্যাকমোহন লাইন পার হয়ে তারা অনেকটা ঢুকে পড়া সত্ত্বেও, চীন দখলীকৃত ভূখণ্ড দখল করে রাখতে চায়নি। সাথে সাথে, ১৯৫৯ সালে ভারত যে নিয়ন্ত্রণ রেখা লঙঘন করেছিল, তাও তারা মেনে নেয়নি। ২৭ অক্টোবর নেহরু তাঁর জবাবে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষায় আগ্রহ প্রকাশ করে বলেন, ১৯৬২ সালের ৮ সেপ্টেম্বরের আগের অবস্থানে ফিরে যেতে। ৪ নভেম্বর চৌ এন-লাই তাঁর জবাবে ১৯৫৯ সালে তাঁর দেওয়া প্রস্তাবের পুনরুল্লেখ করেন ও নেফা রণাঙ্গনে ম্যাকমোহন লাইন ও আকসাই চীনে ম্যাকডোনাল্ড লাইনে ফিরে যাওয়ার কথা বলেন। ফলে সংঘর্ষ বন্ধের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে বলেই মনে হয়। ইতিমধ্যে ভারত সরকার ২৯ অক্টোবর ১৯৬২ দেশের মধ্যে আভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা জারি করে ও তার মধ্য দিয়ে দেশের ভিতর যুদ্ধোন্মাদনা তৈরি করে। ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নেহরুকে সমর্থন করে ও তাদের মদতে নেহরু ১৪ নভেম্বর চৌ এন-লাইয়ের প্রস্তাব খারিজ করে দেন। নেহরু কর্তৃক প্রস্তাব খারিজের পত্র চৌ এন-লাই হাতে পাওয়ার পর, সে লা-তে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান থেকে ওয়ালং রণক্ষেত্রে ভারতের আক্রমণ দিয়ে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হয়। ভারত আক্রমণ করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আকসাই চীন ও নেফা রণাঙ্গনে চীন পাল্টা আক্রমণ করে। ১৭ নভেম্বর সে লা এবং বমডি-লা-তে চীনের সেনাবাহিনী ভারতের প্রতিরোধব্যূহ ভেঙে দেয়। চীন যে পর্যন্ত নিজের সীমানা বলে দাবি করেছিল, চীনের সেনাবাহিনী আরও ঢুকে এসে সেই পর্যন্ত দখল করে। ১৮ নভেম্বর চীনা পদাতিক বাহিনী চু শুলের কাছে প্রচণ্ড আক্রমণ হানে, দুই তরফে তুমুল যুদ্ধের পর ভারতীয় বাহিনী হাল ছেড়ে দেয়। ২০ নভেম্বর বিকালে, নেহরু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে বিমান আক্রমণ ও আকাশ প্রতিরক্ষা সহ সর্বপ্রকার সামরিক সাহায্যের আবেদন জানান। কিন্তু, মার্কিন হস্তক্ষেপের আগেই ১৯ নভেম্বর চীন কূটনৈতিক স্তরে একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে, যা ২১ নভেম্বর থেকে কার্যকর হবে। যুদ্ধবিরতির ঘোষণায় চৌ এন-লাই বলেন,১৯৬২ সালের ২১ নভেম্বর, চীনের অগ্রগামীবাহিনী গোটা সীমান্তে ৭ নভেম্বর ১৯৫৯-এর লাইন অব অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল থেকে কুড়ি কিলোমিটার পিছিয়ে আসবে।

তখনও পর্যন্ত যদিও, চীনের সীমান্তরক্ষীরা পূর্ব রণাঙ্গনে প্রথাগতভাবে চলে আসা সীমান্তরেখার উত্তরে, অর্থাৎ চীনের ভূমির ওপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছিল, তা সত্ত্বেও চৌ এন-লাই ঘোষণা করেন, তারাও বর্তমান অবস্থান থেকে আরও উত্তরে বেআইনি ম্যাকমোহন লাইন পর্যন্ত পেছিয়ে আসবে। পশ্চিম ও মধ্য রণাঙ্গনে চীনা সীমান্তরক্ষীরা লাইন অব অ্যাকচুয়্যাল কন্ট্রোল থেকে কুড়ি কিলোমিটার পেছিয়ে আসবে।

যুদ্ধের আগে যেখানে লাইন অব অ্যাকচুয়্যাল কন্ট্রোল ছিল, চীনের সেনাবাহিনী সেই অবধি পিছিয়ে গেল। অর্থাৎ, যুদ্ধের মধ্য দিয়ে তারা যেসব এলাকা দখল করেছিল, তা তারা ছেড়ে দেয়। কিন্তু যুদ্ধের আগে যে বিতর্কিত এলাকা বাস্তবে তাদের অধিকারে ছিল, সেটা তারা রেখে দেয়। যাই হোক, চীন সরকার ও ভারত সরকার উভয়েই বলে, চীন যতদূর নিজের এলাকা বলে দাবি করতো, চীনের বাহিনী তার থেকে ভেতরে ঢোকেনি। ইনস্টিটিউট অব পীস অ্যাণ্ড কনফ্লিক্ট স্টাডিজ-এর মতে, সেই সময় থেকে চীন নেফার একটা অংশের (বর্তমান অরুণাচল প্রদেশ) ওপর তার দাবি ছেড়ে দিয়েছে। পরবর্তী কয়েক মাসে শুভেচ্ছা প্রদর্শন হিসাবে, চীন, ভারতের থেকে কেড়ে নেওয়া সাঁজোয়া গাড়ি, অস্ত্রশস্ত্র ফেরত দেয় ও যুদ্ধবন্দীদের বিনাশর্তে মুক্তি দেয়। ১৯৬২-র ডিসেম্বরে চীন ৭৩১ জন রোগগ্রস্ত ও আহত ভারতীয় সেনা ফিরিয়ে দেয়। একজন ব্রিগেডিয়ার, ২৬ জন ফিল্ড অফিসার, কোম্পানি সেনানায়ক স্তরের ২৯ জন অফিসার সহ বাকি ৩,২১৩ জন বন্দী এপ্রিল ১৯৬৩ থেকে ভারতে ফিরতে শুরু করে। ভারত কোনও চীনা সেনাকে যুদ্ধবন্দী হিসাবে ঘোষণা করেনি। ভারতীয় যুদ্ধবন্দী শিবিরে ২৬ জন চীনা সৈন্য আঘাতজনিত কারণে মারা যান, অপর ১৫ জনকে ভারত ডিসেম্বর মাসে ফিরিয়ে দেয়।

সীমান্তবিরোধের নিষ্পত্তি আশু ও জরুরি কর্তব্য

ভারত-চীন সীমান্তবিরোধ, যা যুদ্ধ ডেকে এনেছে, এই হল তার ঘটনাপ্রবাহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

এর পর যে আলোচনা শুরু হয়, শেষ পর্যন্ত তা অচলাবস্থায় এসে পৌঁছায়। ফলে, প্রশ্নটা দাঁড়ায়, ভারত ও চীন, দু'দেশের জনগণের স্বার্থে অচলাবস্থা কাটিয়ে কীভাবে সীমান্ত সমস্যার ন্যায্য ও স্থায়ী সমাধান করা যায়। এই আলোচনায়, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে কেবল বিবেচনায় নিলে হবে না, সাথে সাথে, সীমান্তের ও আশেপাশের ভৌগোলিক বিষয়গুলিকেও বিবেচনা করতে হবে। একই সঙ্গে, এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য কার্যকলাপ চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান, সীমান্ত এলাকায় দু'দেশের জনগণের পারস্পরিক সৌভ্রাত্র্য রক্ষার পরিবেশ, তাঁদের ধর্ম, সামাজিক রীতিনীতি, ভাষা প্রভৃতি বিষয়, যা স্বাভাবিকভাবে স্পর্শকাতরতা ও গভীর আবেগ সৃষ্টি করে, সেগুলিকেও বিবেচনায় নিতে হবে। অমীমাংসিত সীমান্তবিরোধ, সর্বদাই প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের হাতে অস্ত্র যোগায়, যাকে কাজে লাগিয়ে তারা সহজেই এক দেশের জনগণকে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে পারে, যুদ্ধোন্মাদনা সৃষ্টি করে বিদ্যমান শোষণমূলক ব্যবস্থার থেকে জনগণের দৃষ্টিকে

সাতের পাতায় দেখুন

দায়ে পড়ে ‘ড্যামেজ কন্ট্রোলে’ নেমেছেন সিপিএম ফ্রন্টের মন্ত্রীরা

সংবাদে প্রকাশ, রাজ্য মন্ত্রীসভার কোর কমিটির বৈঠকে বসে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ২৮ মে পাঁচপাতার একটি নোটে সরকারের করণীয় কাজের মধ্যে কোন্‌গুলি অগ্রাধিকার পাবে, তা চিহ্নিত করেছেন। ঢিলেঢালা ভাব দূর করে কীভাবে কাজ করতে হবে, সে বিষয়েও তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন তিনি। উল্লেখযোগ্য হল, এতদিন ধরে বিরোধীরা যে সব ক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থতার কথা বলে আসছিল, সেই ক্ষেত্রগুলির কথাই বৈঠকে আলোচনা করেছেন তাঁরা।

কোর কমিটিতে কোন্ বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে? আলোচনা হয়েছে, উর্বর জমিতে শিল্পস্থাপন না করে অনুর্বর জমি বেছে নিয়ে জমিব্যাঙ্ক তৈরি করা, পঞ্চায়েত ও পুরসভার কাজে গতি আনা, বিপিএল তালিকার ত্রুটি দূর করা সহ সামগ্রিক ভাবে প্রশাসনিক কাজে স্বচ্ছতা ও দ্রুততা আনার বিষয়গুলি নিয়ে। এ ব্যাপারে অন্যান্য নেতা-মন্ত্রীদের মতামতও চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

৩২ বছরের রাজত্বে সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারের যে প্রশাসনিক কাজে কোনও ত্রুটি আছে, কিংবা এ নিয়ে রাজ্যবাসীর ক্ষোভের যে সঙ্গত কোনও কারণ থাকতে পারে, মুখ্যমন্ত্রী কিংবা তাঁর সহযোগীদের কথাবার্তা ও আচার-আচরণে এতদিন তার কোনও চিহ্ন দেখা যায়নি। বরং ঔদ্ধত্য এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে, উর্বর জমি দখলের বিরুদ্ধে রাজ্যের কৃষিজীবী মানুষ রুখে দাঁড়ালে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ ও ভাড়াটে ক্রিমিনালবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে তাদের খুন করতেও বাধেনি এই নেতাদের। দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতায় থাকার সুবিধা ভোগ করতে করতে ওপরতলার নেতা থেকে শুরু করে পাড়ার চুনোপুঁটি মাতব্বর, প্রত্যেকেই হয়ে উঠেছিলেন উৎকট দম্ভ ও অহংকারের এক একটি আকর। তাহলে হঠাৎ কী কারণে আজ সরকারি কাজের ক্ষেত্রে নিজেদের ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা করতে ও তা শোধরানোর প্রচেষ্টায় মিটিংয়ে বসছেন সিপিএম নেতারা?

আসলে ক্ষমতা ভোগের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা নেতাদের বন্ধ চোখ এবার খুলতে হচ্ছে নেহাত দায়ে পড়ে। কারণ সেই ক্ষমতাই যে এবার যাওয়ার দশায়। এবারের লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যবাসী যে এইভাবে সিপিএমকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে, সে খবর নেতাদের কাছে ছিল না। এমনকী গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল যথেষ্ট খারাপ হলেও লোকসভায় যে এই হাল হবে, সিপিএম নেতারা তা ভাবতে পারেননি। হারের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এখন তাঁরা স্থায়ী সরকারের আকাঙ্ক্ষায় কংগ্রেসের দিকে জনমত ঘুরে যাওয়ার কথা শোনাচ্ছেন। কিন্তু এ যে নেহাত কথার কথা, দলের কর্মী-সমর্থক, সাধারণ মানুষের কাছে দলের প্রকৃত অবস্থাটা আড়াল করার চেষ্টা, তা তাঁদের চেয়ে ভাল আর কেউই জানে না। বাস্তবে, দীর্ঘ ৩২ বছরের সিপিএম অপশাসন, প্রশাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে কুক্ষিগত করা, পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকা ব্যাপক দুর্নীতি এবং বড় থেকে ছোট নেতাদের অসহ্য দম্ভের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছিল। সিঙ্গুর এবং তারপর নন্দীগ্রামে গরিব খেটে-খাওয়া মানুষের ওপর সিপিএমের অকথ্য দমন-পীড়ন-অত্যাচার সেই ক্ষোভের বারুদে আগুন লাগিয়ে দেয়। জীবন-জীবিকা রক্ষায়, বিশেষ করে নন্দীগ্রামের বীর জনগণ দিনের পর দিন পুলিশ ও সিপিএম ক্রিমিনালবাহিনীর ভয়ঙ্কর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রাণ বাজি রেখে রুখে দাঁড়িয়ে যেভাবে সরকারকে পিছু হঠতে বাধ্য করল, তা দেখে গোটা রাজ্যের মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বার নতুন প্রেরণা পায়। তারই ফলে, ভোটের হারে গোটা দেশে যখন নির্বাচনের প্রতি তীব্র অনীহা লক্ষ করা গেছে, তখন এ রাজ্যে যেকোনও মূল্যে সিপিএমকে হারানোর জন্য সকাল থেকে দলে দলে মানুষ লাইন দিয়ে ভোট দিয়েছে এবং সিপিএমকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করেছে।

এই পরিস্থিতিতে ২০১১ সালের বিধানসভা ভোটে হারানো সম্মান পুনরুদ্ধারের আশায় কোমর বেঁধে লেগেছেন সিপিএম নেতারা। সেই উদ্দেশ্যেই কোর কমিটির মিটিংয়ে মুখ্যমন্ত্রীর এই নোট। এবং এই নোট থেকেই পরিষ্কার যে, কোন্ কোন্ বিষয়ে সরকার ব্যর্থ, সিপিএম নেতাদের তা বিলক্ষণ জানা থাকা সত্ত্বেও এতদিন তা রোধে কোনও ব্যবস্থাই তাঁরা নেননি। গড্ডলিকা প্রবাহের মতো সেগুলি চলতেই দিয়েছেন। এখন যখন ক্ষমতার ‘নিরাপদ’ সিংহাসনটিই টলোমলো, তখন ঠেকায় পড়ে ‘ড্যামেজ কন্ট্রোলে’ নেমেছেন। তাই টাটা-সালিমের জন্য উর্বর জমি দখল করতে গিয়ে যে সিপিএম গ্রামবাসীদের উপর লাগাতার অত্যাচার চালাল এবং এর বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদ হলে প্রতিবাদীদের গায়ে ‘উন্নয়নবিরোধী’ তকমা এঁটে দিল, আজ সেই সিপিএম নেতারাই কোর কমিটির মিটিংয়ে শিল্পের জন্য যাতে উর্বর জমি নেওয়া না হয়, সেই ব্যবস্থা করার কথা ভাবছেন। কর্মসংস্থানের স্বার্থে ক্ষুদ্রশিল্প ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার চিন্তা করছেন। কৃষক ও কৃষির স্বার্থে কর্মসূচি গ্রহণের পাশাপাশি পানীয় জল, বিদ্যুৎ ও রাস্তাঘাট নির্মাণে জোর দেওয়ার কথা বলছেন। সাচার কমিটির রিপোর্টে দেখানো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের চরম দুরবস্থার বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভ সত্ত্বেও এতদিন সিপিএম নেতারা তা স্বীকার করেননি। এখন ভোটে ঘা খেয়ে কোর কমিটির মিটিংয়ে বুদ্ধদেববাবুরা সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের জন্য সরকারকে আরও উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলছেন। বিপিএল তালিকার অসংখ্য ত্রুটি সহ রেশন ব্যবস্থার চরম দুর্নীতি নিয়ে বিরোধীদের আন্দোলনকে চক্রান্ত বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন যাঁরা, এখন সেই ত্রুটি সংশোধনের প্রস্তাবই নিতে হচ্ছে তাঁদের।

আসলে দায়ে পড়ে বাঘেও নাকি ঘাস খায়। লোকসভা ভোটে চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়ে তবেই তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে চূড়ান্ত ঔদ্ধত্য ও অহমিকা ঢেকে নিজেদের ভুল-ত্রুটি বিশ্লেষণ করতে বসলেন, তার আগে নয়। এতদিন পর্যন্ত তাঁদের ভাব ছিল, সিপিএম সরকার কোনও ভুল করতেই পারে না এবং রাজ্যে যেটুকু যা সমস্যা আছে, তার জন্য তাঁরা নয়, কেন্দ্রীয় সরকারই দায়ী। এতদিন তাঁরা বলে এসেছেন, শোষণমূলক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি রাজ্যে মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় কাজ করা যায় না। অথচ ৩২ বছর ধরে সরকারে থাকার সুযোগে মানুষের মূল সমস্যা তাঁরা দূর করতে পারতেন না ঠিকই, কিন্তু চাইলে আপেক্ষিক অর্থে একটি নিরপেক্ষ প্রশাসন রাজ্যের মানুষকে ন্যূনতম ‘রিলিফ’ দিতে পারতেন না, এমন নয়। একটি ‘বামপন্থী’ সরকার হিসাবে সেটাই তাঁদের করার কথা ছিল। ক্ষমতায় থাকার সুবাদে যেটুকু সুযোগ-সুবিধা মানুষকে দেওয়া যায়, তা দেওয়ার সাথে সাথে একটি ‘মার্কসবাদী’ দল হিসাবে জনসাধারণের কাছে তাঁদের এই কথাটিই তুলে ধরার কথা ছিল যে, যে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের সার্বিক বিকাশের পথ বন্ধ করে দেয়, সেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখে কোনও সরকারের পক্ষেই মানুষের মূল সমস্যাগুলি সম্পূর্ণভাবে দূর করা সম্ভব নয়, এমনকী সরকারে একটি বামপন্থী দল থাকলেও না। তাই প্রয়োজন, একদিকে দুর্নীতিমুক্ত, নিরপেক্ষ, জনমুখী প্রশাসন কায়েম করা, অন্যদিকে দ্রুত মানুষকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আঘাতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার রাজনৈতিক চেতনায় শিক্ষিত ও সংঘবদ্ধ করে তোলা। তা না করে সরকারে থাকার সুযোগ নিয়ে সিপিএম ও তার সহযোগী দলগুলির নেতা-মন্ত্রী ও তাঁদের দলীয় কর্মীদের সুবিধাভোগী বৃহদংশ আরাম-বিলাসে মগ্ন থেকেছেন, অন্যান্য পুঁজিবাদী সরকারগুলির মতোই ক্ষমতায় বসে জনসাধারণকে নির্মমভাবে শোষণ-লুণ্ঠন করেছেন। দিনের পর দিন অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করার পর এখন যখন সাধারণ মানুষ তাঁদের দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, তখন ক্ষমতার গদিতে টিকে থাকার আকাঙ্খায় ‘ড্যামেজ কন্ট্রোলে’র ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করা আশু ও জরুরি কর্তব্য

ছয়ের পাতার পর

ঘুরিয়ে দিতে পারে। সুতরাং জনগণকেই সচেতন ও উদ্যোগী হয়ে, সীমান্ত সমস্যার ন্যায্য ও স্থায়ী সমাধান করতে নিজ নিজ সরকারকে বাধ্য করতে হবে। ভারত-চীন সীমান্তবিরোধকেও এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই দেখতে হবে।

এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম, সবধরনের ঔদ্ধত্য ও অপরকে ঠকানোর মনোভাব ত্যাগ করতে হবে। চীন সরকার তাদের সমাধানসূত্র মেনে নিতে ভারতকে বাধ্য করতে পারে না, আবার ভারত সরকারও একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়ে তা গিলতে চীন সরকারকে বাধ্য করতে পারে না। এক সময়ে, চীনের সমাজতান্ত্রিক সরকার উদ্যোগী হয়ে,খোলা মনে এবিষয়ে আলোচনা শুরু করতে চেষ্টা করেছিল। আলোচনার ভিত্তিভূমি কী হবে, সে সম্পর্কেও তারা তাদের প্রস্তাব রেখেছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে, চীন সমাজতন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে অধঃপতিত হয়েছে। অতীতের সমাজতান্ত্রিক চীন সরকার যে উদার ও খোলামেলা মন নিয়ে চলেছিল, বর্তমান সরকার তার কতটা রক্ষা করে চলবে তা আমরা নিশ্চিতভাবে জানি না। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, অতীতে চীন সরকার যে অবস্থান নিয়েছিল তা থেকে পুরোপুরি সরে আসা বর্তমান সরকারের পক্ষে সহজ হবে না। কাজেই, অতীতে সমাজতান্ত্রিক চীন সরকার যে প্রস্তাবগুলি দিয়েছিল, সেগুলি কতটা যুক্তিসঙ্গত ও কার্যকর, তা উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। ভারত সরকারেরও উচিত খোলামনে বিষয়টা নিয়ে এগোন। ঔদ্ধত্য বা হালছাড়া মনোভাব দিয়ে কোনও কাজ হবে না।

দু’দেশের জনগণকেই যুক্তিসঙ্গতভাবে সীমান্তবিরোধের মীমাংসায় এগিয়ে আসতে হবে

এই ধরনের বোঝাপড়া ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে, পারস্পরিক চেষ্টা ও আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে, দু’দেশের জনগণের মধ্যে সুদৃঢ় সম্প্রীতি ও মৈত্রী বজায় রেখেই এব্যাপারে মীমাংসায় পৌঁছতে হবে। এইভাবে যে সিদ্ধান্তই গৃহীত হোক তাকে দু’দেশের জনগণের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য হতে হবে। ভারত ও চীন দুটি দেশেরই দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্য আছে, যার ভিত্তিতে দু’দেশের জনগণেরই আশা আকাঙ্ক্ষা গড়ে উঠেছে। দু’টি দেশের মধ্যেই দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের মহান ঐতিহ্য আছে। সীমান্তবিরোধ নিয়ে যেকোনও আলোচনার মেজাজ ও গতিধারা, এই প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় রেখেই নির্ধারণ করতে হবে। আমরা আবারও বলতে চাই, দু’দেশের জনগণের কর্তব্য হল, যতদূর সম্ভব দ্রুত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে, ন্যায্য ও স্থায়ী সমাধানে পৌঁছানোর জন্য নিজ নিজ সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা।

(সমাপ্ত)

সাংসদকে পাশে পেয়ে অভিভূত মানুষ

চারের পাতার পর

সেখানেও আমি আপনাদের বাঁচার দাবি তুলে ধরব, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করব, তারপর আবার আপনাদের পাশেই ফিরে আসব, দাবি আদায়ের জন্য প্রয়োজনে আন্দোলন গড়ে তুলব। চরম বিষাদের মধ্যেও সর্বত্রই মানুষ তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানান।

উল্লেখ্য, গোসাবা, সাতজেলিয়া, রাধানগর, রাঙাবেলিয়া, লাহিড়িপুর, মোল্লাখালি প্রভৃতি এলাকায় এস ইউ সি আই কর্মীরা সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে ত্রাণের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। বিডিও অফিস থেকে বরাদ্দ ত্রাণ আদায় করে আনা, বিতরণ করা, পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, গবাদিপশুর মৃতদেহগুলি পুঁতে ফেলা, ঘরবাড়ির ধ্বংসস্তূপ সরানো ইত্যাদি কাজ অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাঁরা করে চলেছেন। মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের উদ্যোগে গোসাবা, বালি, রাঙাবেলিয়া, সাতজেলিয়া ও লাহিড়িপুর পঞ্চায়েত এলাকায় যে চিকিৎসাশিবিরগুলি চলছে, সেগুলিতেও তাঁরা স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করছেন। সাংসদ ডাক্তার তরুণ মণ্ডলের পাঠানো খাদ্য ও পোষাক ছোট-মোল্লাখালির হেতালবাড়ি বালোয়ারি স্কুল এবং পি কে প্রাইমারি স্কুলের ত্রাণশিবির থেকে প্রায় এক হাজার মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

মেদিনীপুরে সর্বদলীয় বৈঠকে এস ইউ সি আইয়ের তীব্র ক্ষোভ

২৪ এবং ২৫ মের প্রবল ঘূর্ণিঝড় পশ্চিম মেদিনীপুর জেলারও বিরাট অংশে ঘরবাড়ি, চাষ-আবাদ এবং গবাদি পশুর জীবনহানি ঘটিয়েছে। ২৬ মে জেলাশাসকের মিটিং হলে প্রশাসনের ডাকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিক সহ সর্বদলীয় বৈঠকে জেলাশাসক স্বীকার করেন আচমকা এই ঘূর্ণিঝড়ের ব্যাপারে আগাম কোনও প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব হয়নি। বৈঠকে এস ইউ সি আই দলের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেড অমল মাইতি, প্রাণতোষ মাইতি, প্রভঞ্জন জানা। তাঁরা জেলাশাসকের বক্তব্যে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ঘূর্ণিঝড় বা এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ আচমকাই আসে। প্রশাসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না রাখাটা চরম ব্যর্থতা। এবারের ঝড়ে মেদিনীপুর শহরের কাঁচা বাড়ি অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। নারায়ণগড়, বেলদা, দাঁতন, এগরা, মোহনপুর প্রভৃতি এলাকার ঘরবাড়ি গবাদিপশু, পানবরোজ, বাদাম, তিল ইত্যাদি চাষ ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এইসব চাষের ক্ষতি জেলার সর্বত্র। ক্ষতি হয়ে গেছে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা।

নেতৃবৃন্দ বলেন, কেলেঘাই, কপালেশ্বরী, কাঁসাই নদীর সংস্কার এবং বাঁধ মেরামত বিন্দুমাত্র হয়নি। ফলে বৃষ্টি হলেই বন্যা হবে এবং গত বছর ৫৬ জন মানুষের প্রাণহানি সহ যে বিপুল পরিমাণ ক্ষতি হয়েছিল, তা এ’বছরও ঘটতে যাচ্ছে। এখনও যতটুকু সময় আছে যুদ্ধকালীন গুরুত্ব দিয়ে এই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে জেলা প্রশাসনের কাছে তাঁরা দাবি জানান। নদীভাঙন রোধে জরুরিকালীন তৎপরতা সহ বন্যায় প্রাণ বাঁচাতে স্পিডবোট ইত্যাদি রাখার দাবিও জানান।

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2007-09
P. R.(Fgn) No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/FGN - 028/2007-09

পর্যাপ্ত ত্রাণের দাবিতে ৩০ মে কলকাতায় বিক্ষোভ মিছিল। মিছিলের পুরোভাগে রাজ্যসম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সৌমেন বসু, বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার, সাংসদ কমরেড তরুণ মণ্ডল প্রমুখ

কুলতলিতে ভাঙা বাঁধ ঘুরে দেখছেন বিধায়ক কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার

বিপন্ন মানুষের ত্রাণে উদার হস্তে সাহায্য করুন

একের পাতার পর

কোনও কিছুই কি সরকার করেছে? এত ভয়ঙ্কর দুর্যোগের সময়েও তার হদিশ কেউ পায়নি। উদ্ধারকার্যে ও রিলিফের জন্য বি ডি ও দপ্তরে সাহায্য চাইতে গেলে সব বি ডি ও একবাক্যে জানিয়েছেন, সাহায্য দেওয়ার মতো কোনও কিছুই তাদের হাতে নেই। স্পিড বোট, লঞ্চ, নৌকা, মজুত খাদ্য, ত্রিপল বা পলিথিন কোনও কিছুই নেই। অর্থাৎ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কথাটা আছে, আর কিছু নেই। এ অবস্থায় স্থানীয় মানুষই একে অপরকে বিপদের দিনে যতটুকু পারে সাহায্য করেছে, সকলে মিলে দুঃখ ভাগ করে নিয়েছে, বাজারে-দোকানে সামান্য চিঁড়েমুড়ি যা ছিল, যতটুকু পেরেছে দিয়েছে। কিন্তু তাতে কী হয়! পরদিন ঝড়-বৃষ্টি কমার পর রাজ্য সরকারের সক্রিয়তা দেখা গেল, মুখ্যমন্ত্রী ১০ মিনিটের জন্য কুলতলির জামতলাতে শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করে নিমপীঠে আমলাদের নিয়ে বৈঠক করে নানা আশ্বাস শোনালেন, যা সচিত্র সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। অন্যদিকে তৃণমূল নেত্রী ও রেলমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী কেন্দ্রকে মিলিটারি নামাতে অনুরোধ করলেন, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জানালেন, মিলিটারি উদ্ধারকার্যে নামছে। অথচ ২৫ মে আসল দুর্যোগের দিন সেই মিলিটারিও কোথাও পৌঁছাল না, পরের দিন সকালে কোনও কোনও জায়গায় পৌঁছাল।

এখন পর্যন্ত যে রিলিফ পাঠানো হয়েছে, তা অতি সামান্য এবং সর্বত্র পৌঁছায়নি। বেশিরভাগ দুর্গত মানুষ কিছুই পায়নি। এভাবে চললে অনাহারে, দূষিত জল পান করে, মহামারি এবং বিনা চিকিৎসায় ব্যাপক প্রাণহানি ঘটবে। যতটুকু রিলিফ গেছে, তা বন্টন নিয়েও ইতিমধ্যেই দুর্নীতি, দলবাজি ও স্বজনপোষণ শুরু হয়েগেছে। যে মর্মান্তিক ক্ষতি হয়েছে, তা কোনওভাবেই পূরণ হবে না। জলস্রোতে যেসব প্রাণ বিনষ্ট হয়েছে, আরও যারা অনাহারে ও বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে, তাদের আর ফিরে পাওয়া যাবে না। যারা কোনওক্রমে বেঁচে থাকবে, তাদেরও চলবে কী করে! ঘর নেই, যার যা মজুত খাদ্যদ্রব্য, আসবাবপত্র, গবাদি পশু ছিল, সব ভেসে গেছে। লোনা জলে পুকুর ও মাছ নষ্ট হয়ে গেছে, লবণাক্ত জমিতে আগামি বেশ কিছুদিন চাষ করাও যাবে না। কত পরিবার যে পুরোপুরি সর্বস্বান্ত পথের ভিখারি হবে, তার পরিসীমা নেই। এর জন্য কি শুধু প্রকৃতিকেই দায়ী করলে হবে?

একথা জানা দরকার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও এত ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, প্রাণহানি অনিবার্য ছিল না। প্রথমত, ঝড় হলে সুন্দরবন অঞ্চলের নিবিড় দীর্ঘ বনাঞ্চল তার তীব্রতা অনেকটা আটকাত। দীর্ঘদিন ধরে পুলিশ ও সরকারি মদতে এক দুষ্ট ব্যবসায়ী চক্র তাকে ধ্বংস করে চলেছে। ফলে ঝড় প্রতিরোধের আগের মতো ক্ষমতা এই বনাঞ্চলের নষ্ট হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, বাঁধগুলি নিচু, পুরনো এবং ফাটল ধরা। সেগুলিকে উঁচু, মজবুত ও মেরামত করার কোন ব্যবস্থা হয় নি। তৃতীয়ত, পলি জমে নদীগুলোর গভীরতা অনেক কমে গেছে, অল্প জলেই ভেসে যায়। নিয়মিত নদীগুলোর ড্রেজিংয়ের ব্যবস্থা করা দরকার ছিল, তা করা হয় না। সাইক্লোন

শেল্টার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও সরকার তা করেনি। সাইক্লোন শেল্টার থাকলে বহু মানুষ বাঁচতে পারত। সমুদ্রের উপকূলে এই ধরনের বিপদ আছে জানা সত্ত্বেও স্বাধীনতার পর এত দীর্ঘ বছর রাজ্য ও কেন্দ্র উভয় সরকারই কোনও উদ্যোগ নেয়নি।

আমরা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি করছি—

১। অবিলম্বে রান্না করা বা শুকনো খাদ্য এবং পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে।

২। বিপর্যস্ত এলাকায় মেডিক্যাল টিম পাঠাতে হবে এবং গ্রামীণ হাসপাতালগুলিতে উপযুক্ত সংখ্যায় ডাক্তার ও নার্সের ব্যবস্থা করতে হবে। বন্ধ হাসপাতালগুলি অবিলম্বে চালু করতে হবে।

৩। পুরনো টিউবওয়েলগুলি মেরামত করতে হবে এবং নতুন টিউবওয়েল বসাতে হবে।

৪। নদীবাঁধগুলি দ্রুত মেরামত করতে হবে এবং বর্ষার জল ও নদীর জলোচ্ছ্বাস প্রতিরোধে নদীবাঁধগুলি উপযুক্তভাবে সংস্কার করতে হবে। সমস্ত সাইক্লোনপ্রবণ এলাকাগুলিতে সাইক্লোন শেল্টার করতে হবে।

৫। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে দুর্গত মানুষদের জন্য সারা বছরের খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। ক্ষতিগ্রস্ত লক্ষ লক্ষ পরিবারের গৃহনির্মাণ ও মেরামতির দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।

৭। দুর্গত এলাকায় স্কুল-কলেজের সমস্ত ফি এবং কৃষকদের সমস্ত ঋণ এবং বকেয়া খাজনা মকুব করতে হবে।

৮। পুকুরের লোনা জল বের করার ব্যবস্থা করতে হবে এবং হাজার হাজার একর জমি, যেগুলিতে লোনা জল ঢুকেছে, সে জমি চাষযোগ্য করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৯। ক্ষতিগ্রস্ত মাছচাষিদের মাছ চাষের জন্য সরকারি অনুদান দিতে হবে।

১০। সমস্ত কর্মক্ষম মানুষের কাজের বন্দোবস্ত করতে হবে।

১১। মৃত ও আহত পরিবারবর্গকে যথাক্রমে ৭ ও ৩ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

১২। বিশিষ্ট নাগরিক ও সর্বদলীয় প্রতিনিধিদের তদারকিতে রিলিফ বন্টন করতে হবে।

এই দাবিগুলি আদায়ের জন্য একদিকে আমাদের দল জনগণকে সংগঠিত করে আন্দোলন চালিয়ে যাবে, অন্যদিকে ত্রাণকার্যও চালাবে। আমরা ইতিমধ্যেই ২৬ মে থেকে নিজেদের উদ্যোগে দলমতনির্বিশেষে সকলকে নিয়ে দুর্গত এলাকায় বেশ কিছু ত্রাণশিবির চালিয়ে যাচ্ছি। সর্বত্র এই ত্রাণশিবির আরও করতে হবে। আমরা মেডিক্যাল ক্যাম্পও শুরু করেছি। দুর্গত মানুষের ত্রাণের জন্য এই মুহূর্তে প্রয়োজন বিপুল অর্থ, খাদ্য, মাথার আচ্ছাদন হিসাবে ত্রিপল বা পলিথিন সিট, জামা-কাপড় এবং ঔষধ। রাজ্যবাসীর বিবেকের কাছে আমাদের আবেদন, অতীতেও আপনারা বারবার বিপন্ন মানুষের ত্রাণে উদার হস্তে সাহায্য করেছেন, এবারেও এই অসহায় দুর্গত মানুষদের বাঁচাবার জন্য এগিয়ে আসুন। আমরা নানা সমিতি, সংগঠন, ক্লাব, বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকেও অতীতের মতো ত্রাণকার্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার আবেদন জানাচ্ছি।

ত্রাণ নিয়ে দলবাজি ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভে বক্তব্য রাখছেন বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার, ৩০ মে কলকাতায়

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোনঃ সম্পাদকীয় দপ্তরঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তরঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্সঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci.in